

নিত্যানন্দ-চরিত ।

ভারত ধর্ম-মহামণ্ডলের সভ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য

নবদ্বীপ বৈষ্ণবধর্ম-সংরক্ষণী সভার মেম্বর

এবং

নানাবিধ সংবাদ পত্রের লেখক

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত ।

“তব কথামৃতং তপ্ত জীবনম্,
কবিভিরীড়িতং কল্যাণপং ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্,
ভুবি গুণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ ॥”

শ্রীমন্তাগবত

কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী হইতে

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ।

মূল্য ১/- এক টাকা মাত্র ।

কলিকাতা,
শ্রামবাজার, ৭ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
প্রিন্টার—শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী।

১৩১৫।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

সে আজ চারিশত বৎসরের অধিক কালের কথা। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে যে মহাপুরুষের বিরহ-তপ্ত হৃদয়ের প্রেমপূর্ণ আকুল আহ্বানে ভারতবাসীর ধর্ম জীবন মাতিয়া উঠিয়াছিল, যাহার অজস্র করুণা বর্ষণে তৃষ্ণাতুর বঙ্গদেশ প্রেমের বহুয়া ভাসিয়া গিয়াছিল, যাহার মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি ও ভুবন-মঙ্গল হরি-সংকীর্ণনে নদীয়া নগরী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার অমানুষিক দৈবতেজঃ দর্শনে সার্ক-ভৌম প্রমুখ মহৎ হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল, কালচক্রে সে মহীয়সী মুক্তি অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, সে আনন্দোৎসব থামিয়া গিয়াছে, বৈষ্ণব সমাজের সে উদ্যম প্রেম, উদ্দগু নৃত্য, অবিরাম অশ্রুধারা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু খোলকরতালের সেই অক্ষুট মধুরধ্বনি আজিও বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে সেই পবিত্র প্রেমের অক্ষয় স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। অদ্যাপি সেই বিশ্বজনীন প্রেমের নিম্নল প্রবাহ জড়জগতের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সাধু হৃদয়ে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। তাই জীবিকা-সঙ্কটের এই ঘোরতর হৃদ্বিনেও ভারতীয় হিন্দুগণ সেই বিশ্বপ্রেমিকের আনন্দ-হিল্লোলিত-ভক্তি-ভঙ্গিম মনোহর মূর্তির ধ্যান করে, তাঁহার অতীত জীবনের আলোচনা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে, সেই লীলারহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, বলা বাহুল্য এই ধর্মপ্রাণতাই ভারতবাসীর সম্বল, হিন্দুধর্মের ভিত্তি, ভারতের গৌরব। বিগত ১৩১২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে “ভাদ্রা আড়রা-কুমেদ শ্রীগৌরান্দ ধর্মসভার” নির্দেশ অনুসারে আনন্দ বাজার পত্রিকায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ চরিতাধ্যায়ককে পুরস্কার দানের জন্ত একটা বিজ্ঞাপন

প্রকাশিত হইয়াছিল, বহুকাল পরে ধর্মবীর নিত্যানন্দের জীবন-চরিত প্রণয়ন জন্ত বৈষ্ণব সমাজের করুণ নেত্র নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া আমার মন বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হৃদয়তন্ত্রী ব্যঞ্জিয়া উঠিল, আবার ক্ষুদ্র হৃদয়ে মহতী আশা সঞ্চারিত হইল। এই সময় আমার জনৈক বন্ধু নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার জন্ত আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, একবার মনে করিলাম আমার ত্রায় অযোগ্য ব্যক্তির এরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা ও বিড়ম্বনা মাত্র; আবার ভাবিলাম অকৃতকার্য হইলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? ফলে এই হইল বিজ্ঞাপন পাঠে নিত্যানন্দ-চরিত প্রণয়ন জন্ত যে ক্ষীণ আশা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, বন্ধুবর্গের উৎসাহ বাণীতে তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; কাজেই নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার অদমনীয় লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। অবশেষে দীনতার সহিত শ্রীভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া কর্মক্লাস্ত জীবনে যে উজ্জল মূর্তি হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল তাঁহারই চরণপ্রান্তে এ অধমের অসম্পূর্ণ আশা ও আনন্দ রাখিয়া অযোগ্যতার বাধাসত্ত্বেও (উদ্ধারিব বামনঃ) পুস্তক লিখিতে উদ্যত হইলাম। একে যোগ্যতার অভাব, তাহাতে আবার জীবন সংগ্রামের কঠোর তাড়নায় চাকুরীগত জীবনের অনবসর, এই দুই কারণে আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রন্থ শেষ করিতে পারিলাম না, অগত্যা ধর্মসভার নিকট আরও কিছু সময় প্রার্থনা করিলাম। সত্য মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্বক তাহা মঞ্জুর করিলেন। ক্রমাগত নয়মাস কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তবে গ্রন্থ শেষ করিলাম, এবং পুস্তক পরীক্ষকগণের নিকট পাঠাইলাম। পরে জানিতে পারিলাম ভগবৎ রূপায় ২৫শ্রীত 'নিত্যানন্দ-চরিত' পরীক্ষার উচ্ছ্রান অধিকার করিয়াছে এবং “ভাদ্রা আড়রাকুমেদ শ্রীগৌরঙ্গ ধর্মসভা”

প্রাগ্‌নির্দিষ্ট পদক পুরস্কার দান করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, ইহা গ্রন্থকারের পক্ষে আশার কথা সন্দেহ নাই।

এই পুস্তক চৈতন্ত চরিতামৃত, চৈতন্ত ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল ও ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের ছায়া লইয়া রচিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ-চরিত লিখিতে যাইয়া অনেক স্থলেই চৈতন্ত-চরিত লিখিতে হইয়াছে হয় ত কেহ কেহ ঐ সমুদয় অংশকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, কারণ চৈতন্ত-চরিত ও নিত্যানন্দ-চরিত যুগপৎ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, কাজেই চৈতন্ত-লীলা বাদ দিয়া নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার উপায় নাই।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সাধারণে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন কি না জানি না, কারণ ইহা ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও স্বাধীন মতের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে ; কিন্তু তিনি যে একজন ঐশী-শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ এবং ধর্মজগতে যে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব উজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মত বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা নাই।

চিত্রকর ও চরিত লেখক উভয়ই চিত্রকর। স্ননিপুণ চিত্রকর যেমন আপনার অসাধারণ যোগ্যতাবলে যে কোন মূর্তিকেই সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়া লোকরঞ্জন করিতে পারেন, সুদক্ষ চরিত-লেখকও সেই-রূপ স্থায়ী লিপি চাতুর্য্যে মনোহর জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়া পাঠক-গণের সন্তোষ বিধান করিতে পারেন। এই আশাতেই “ভাদ্রা আড়রা-কুমেদ শ্রীগোরাঙ্গ ধর্মসভা” নিত্যানন্দ চরিতাখ্যায়ককে শ্রীল শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয়ের ছন্দানুবর্তী হইয়া অমিয় নিমাই চরিতের ন্যায় মধুর ভাষায় নিত্যানন্দ-চরিত প্রণয়ন জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, শিশির বাবুর ন্যায় যোগ্যতা, ধর্মপ্রাণতা, ও সাহিত্যিক

প্রতিভা এই গ্রন্থকারের কিছুই নাই। বলিতে কি শিশির বাবু অমিয় নিমাই-চরিত প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে একরূপ নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন; কাজেই প্রাপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার ন্যায় যোগ্যতা প্রদর্শন করা মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যে একান্তই অসম্ভব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবে ভরসা মাত্র এই যে, যে মহানু আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-চরিত লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা ভক্তিরসে সুপরিণত ও মাধুর্য্যময়ী ভাষা দ্বারা অলঙ্কৃত না হইলেও সঙ্গদয় পাঠকগণ ইহাকে বিষয় গৌরবে দীপ্তিমান ও সদ্য উদ্বোধিত হৃদয়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল বলিয়াই মনে করিবেন। অবশেষে উপসংহারে বক্তব্য এই, যাঁহাদের অনুকূল যন্তব্য ও উৎসাহ বাণী এই গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ঐচৈতন্যদ, ৪২৩২০শে বৈশাখ,
বুতনী, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

বিনীত—

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

জন্মভূমি ও পূর্বপুরুষগণের পরিচয়, জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের গণনা, নিত্যানন্দ বংশের মৌলিকতা, বটব্যাল গ্রামী হওয়ার কারণ, সুন্দরামলের কর্মজীবন, স্বপ্নদর্শন, হাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ, হাড়াই পণ্ডিত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন, নিত্যানন্দের জন্ম, শুভ অনারম্ভ, নামকরণ, বাল্যলীলা, নিত্যানন্দের খেলার বিশেষত্ব, কংসবধ, কালীয়দমন, ব্রজ-লীলার অভিনয়, লক্ষণ শক্তিশেল, এ বালক মানুষ না দেবতা ? ১—১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নিত্যানন্দের উপনয়ন, শিক্কলাভ ও ন্যায় চূড়ামণি উপাধি প্রাপ্তি, শ্রীগোরাঙ্গের জন্ম ও নিত্যানন্দের হর্ষোচ্ছ্বাস, বাল্যাবস্থায় হরিনাম-প্রীতি, অলৌকিক ঘটনা, সন্ন্যাসীর আগমন, সন্ন্যাসীর ভিক্ষা প্রার্থনা, সন্ন্যাসীকে পুত্রদান, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, নিত্যানন্দ অনন্তপথের পথিক হইলেন । ১৭—২৫

তৃতীয় অধ্যায় ।

নিত্যানন্দ ও নবীন সন্ন্যাসী, বারাণসী গমন, প্রয়াগে গমন, ও নিত্যানন্দের জলক্রীড়া, নৈমিষারণ্য ভ্রমণ, শ্রীপর্বতে গমন ও ভিক্ষা গ্রহণ, বৌদ্ধমঠে গমন । ২৬—৩০

চতুর্থ অধ্যায় ।

লক্ষ্মীপতি ও বিঠলনাথ, লক্ষ্মীপতির স্বপ্নদর্শন, নিত্যানন্দের দীক্ষা গ্রহণ, পাত্রভেদে শাস্ত্রবিধির প্রয়োজনীয়তা, গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার

কারণ, লক্ষ্মীপতির পণ্ডরপুর ত্যাগ, নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্রপুরী,
নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্রপুরীতে কথোপকথন, আশ্রয় সমর্পণেই সূত্থের
পরিসমাপ্তি, প্রেম-প্রবাহ । ৩১—৩২

পঞ্চম অধ্যায় ।

তীর্থযাত্রা, গঙ্গাসাগরে গমন, স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরান্ধ দর্শন । ৪০—৪২

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

নবদ্বীপের পথে, নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোথায় ? নন্দন আচার্য্যের
আলয়ে, নিমাইর বলরাম ভাবপ্রাপ্তি, ভগবান ভক্তের অধীন, নিমাই
ও নিতাই, শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, নিমাই ও নিতাইয়ে
কথা, নিত্যানন্দের উত্তর, নিতাই নিমাইর সঙ্গী হইলেন । ৪৩—৫৩

সপ্তম অধ্যায় ।

বাসপূজার উদ্যোগ, শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে সংকীৰ্ত্তন, নাড়া
কে ? নিতাইর বলরাম ভাব প্রকাশ, শ্রীবাস পণ্ডিত বাস পূজার
আচার্য্য, নিত্যানন্দের বাসপূজা, শ্রীগৌরান্ধের বাস পূজার নৈবেদ্য
বিতরণ । ৫৪—৫৯

অষ্টম অধ্যায় ।

নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ দর্শন, শ্রীগৌরান্ধের ষড়্ভুজমূর্ত্তি ধারণ, নিত্যা-
নন্দের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ, নিত্যানন্দের শ্রীগৌরান্ধস্ততি । ৬০—৬৩

নবম অধ্যায় ।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ, শ্রীগৌরান্ধ ও শ্রীবাস পণ্ডিতে
কথা, মহাপ্রভুর বরদান, শচীমাতার স্বপ্ন বৃত্তান্ত, শ্রীগৌরান্ধ ও শচী
মাতার কথোপকথন । ৬৪—৬৭

দশম অধ্যায় ।

নিত্যানন্দ ও বিশ্বস্তর, এ কি আমার সেই প্রিয়তম বিশ্বরূপ ? শচী মাতার অলৌকিক ঘটনা দর্শন, মুরারি গুপ্তের নিত্যানন্দ প্রীতি, মুরারী গুপ্তের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি ।

৬৮—৭১

একাদশ অধ্যায় ।

দিগম্বর নিত্যানন্দ, ভক্তগণ কর্তৃক নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ, গৌর নিতাইর নৃত্য, মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের কোপীন বিতরণ, মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-মহিমা প্রচার ।

৭২—৭৬

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বাঙ্গালার অবস্থা, জগন্নাথ রায় ও মণ্ডব রায়, গোড়ীয় যুগে সাহিত্য চর্চা, নবদ্বীপে বাহুবল ও জ্ঞানবলের সম্মিলন ।

৭৭—৮০

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

শ্রীগোরাঙ্গের ভগদ্ভাবে প্রকাশ, নবদ্বীপে সর্ব প্রথম হরিনাম প্রচার, হরিদাস কে ? হরিদাসের ধর্মাবল, ঈশ্বরমাই প্রকৃষ্ট প্রতিহিংসা, দুই জন নবীন সন্ন্যাসী, সাধুকার্যে বহু বিঘ্ন, নবদ্বীপে নবভাবের বিকাশ নাম মাহাত্ম্য প্রচার ও সংকীর্ণনের সূচনা ।

৮১—৮৭

চতুর্দশ অধ্যায় ।

জগাই মাধাই, জীব মাট্রেই সুখের জন্য ব্যস্ত, সুখ পরিবর্তনশীল কেন ? নিত্যানন্দ ও হরিদাসের নাম বিলাইতে গমন, জগাই মাধাইর দুর্ব্যবহার, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের কথা ।

৮৮—৯৩

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

নিত্যানন্দের প্রেম, কঠোর পরীক্ষা, মারলি ব'লে কলসীর কাণা
তাই ব'লে কি প্রেম দিব না ? জগাইর কঠিন হৃদয় বিচলিত হইল,
অনুতাপের পূর্বাভাস, মহাপ্রভুর আগমন ও অনুশোচনা, মহাপ্রভুর
ক্রোধান্বিত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ ও সুদর্শন চক্রের
আহ্বান, নিত্যানন্দের করুণা, মহাপ্রভুর ভাব পরিবর্তন, শক্তি সঞ্চার,
জগাই মাধাইর উদ্ধার, জগাই মাধাইর আত্মগানি, মহাপ্রভুর আলয়ে
গমন, পাপের প্রায়শ্চিত্তের দুইটি প্রধান উপায়, ভক্তদ্রোহী ভগবানের
নিকট ক্ষমার অযোগ্য, মহাপ্রভুর হৃদয় কোমল হইল, নিত্যানন্দের
দয়া, জগাই মাধাইর গঙ্গাতীরে গমন, জাহ্নবী-বক্ষে গৌর নিতাই,
জগাই মাধাইর পাপোৎসর্গ, নবজীবন প্রাপ্তি, মাধাইর আত্মগানি, ঐশী
শক্তির অভিব্যক্তি ও ভগবৎ প্রেমের বিকাশ, নবদ্বীপে মাধাইর
ঘাট ।

৯৪—১১৭

ষোড়শ অধ্যায় ।

সংকীৰ্ত্তনে গৌর নিতাই, সংকীৰ্ত্তনই কনির ধর্ম্ম, মহাপ্রভুর নূতন
ব্যবস্থা, নামাপরাধ ভগবৎ-প্রেমলাভের প্রবল অন্তরায়, মহাপ্রভু ও
অদ্বৈত প্রভুর কথোপকথন, অদ্বৈত প্রভুর অনুশোচনা, আচার্য্যরত্নের
বাড়ীতে কৃষ্ণলীলার অভিনয়, বিষ্ণুপ্রিয়ায় অভিনয় দর্শন, অদ্বৈতপ্রভুর
জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা, সন্ন্যাসী-গৃহে গৌর নিতাই, নিত্যানন্দ ও বামাচারী
সন্ন্যাসী, অদ্বৈত আলয়ে হুই প্রভু, মহাপ্রভুর ভাবাবেশ, হরিনদী গ্রামে
গমন, গৌরীদাসকে বৈঠাদান ।

১১৮—১৩৩

সপ্তদশ অধ্যায় ।

জীবে প্রেম, দৃষ্ট লোকের বড়যন্ত্র, নবদ্বীপে মহা সংকীৰ্ত্তন ও কাজী দমন, চাঁদ কাজির ভগবৎ-প্রেমলাভ ও নবদ্বীপ নিরুপক, সন্ন্যাস মন্ত্রণা, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কথা, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ লইয়া বাদানুবাদ, মহাপ্রভুর ভাবান্তর, শ্রীগোরাঙ্গের গৃহত্যাগ, কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট গমন, শ্রীগোরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ ও শ্রীচৈতন্য নাম প্রাপ্তি, অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে গমন । ১৩৪—১৪৪

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

নীলাচলে যাত্রা, উড়িষ্যার পথে, নিত্যানন্দ কর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ, দণ্ড কোথায় ? নিত্যানন্দের উত্তর, পুরীর পথে, সার্কভৌমের ব্রহ্মজ্ঞান । ১৪৫—১৫০

উনবিংশ অধ্যায় ।

সার্কভৌম-গৃহে নিত্যানন্দ, শ্রীজগন্নাথ দর্শনে নিত্যানন্দের ভাবাবেশ, দাক্ষিণাত্য গমনের উদ্যোগ, বিদায় গ্রহণ, প্রত্যাবর্তন । ১৫১—১৫৫

বিংশ অধ্যায় ।

নীলাচলে প্রত্যাগমন, শান্তিপু্রে ভক্ত-সম্মিলন । ১৫৬—১৫৭

একবিংশ অধ্যায় ।

গৌড়ীয় যুগে নূতন ধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, উভয়ের সম্বন্ধ, জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণেই আত্মার পুষ্টি হয়, কলিযুগে ভক্তিপথ অবলম্বনীয় কেন ? সপ্রেম-ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়, চৈতন্যদেবের মতের সার্কভৌমিকতা, বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষত্ব । ১৫৮—১৬৫

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

মহাপ্রভুর নুতন কৌশল, মহাপ্রভুর আদেশ, শ্রীভগবানের ইচ্ছা
পূর্ণ হইল, নিত্যানন্দ প্রভুর সপরিবারে গোড়ে গমন, দ্বাদশ গোপালের
নাম এবং যুগভেদে সম্বন্ধ নির্ণয় । ১৬৬—১৭১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

পানিহাটীতে গমন, কলির নুতন গায়ত্রী প্রচার, নিত্যানন্দের
অভিষেক, অলৌকিক ঘটনা, পানিহাটীতে প্রেম তরঙ্গ । ১৭২—১৭৬

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

অবধূতের অলঙ্কার ধারণ, সন্ন্যাস পরিত্যাগের কারণ, দোষ
তেজীয়ান্ পুরুষকে স্পর্শ করে না, গঙ্গাতীরে গমন, গদাধর মিলন,
বৈষ্ণবধর্ম্মে নিত্যানন্দের প্রভাব, গদাধর কর্তৃক কাক্সি উদ্ধার,
খড়দহে গমন । ১৭৭—১৮৩

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে, উদ্ধারণ দত্তের পরিচয়, সপ্তগ্রামে প্রেমতরঙ্গ
ধর্ম্মরাজ্যে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে না, নিত্যানন্দের সমদর্শিতা,
সুবর্ণ বণিগ জাতির ঐতিহাসিক বিবরণ । ১৮৪—১৯০

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

অদ্বৈত আলয়ে গমন, হৃৎকের পরিসমাপ্তিই সূখ, বিচ্ছেদান্তে মিলন,
অদ্বৈত প্রভুর স্তুতি । ১৯১—১৯৪

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

শূন্য নদীয়ায় নিতাইচাঁদ, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় অবস্থা, শচীমাতার
নিত্যানন্দ দর্শনে হর্ষোচ্ছ্বাস, নবদ্বীপে নবভাব । ১৯৫—১৯৮

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

চোর দস্যুর উদ্ধার, হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে গুপ্তচর প্রেরণ, দস্যুগণের কল্লনা, দস্যুপতির চণ্ডীপূজা, অলৌকিক লীলা রহস্য, চোর চুড়ামণির নিত্যানন্দ স্বরণ, দস্যুপতির নিত্যানন্দ স্তুতি, দস্যুপতির নবজীবন প্রাপ্তি ।

১৯৯—২০৬

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

নিতাই চরিতে সন্দেহ, ব্রাহ্মণ কুমারের নীলাচলে গমন, মহাপ্রভু ও ব্রাহ্মণ কুমারে কথোপকথন, সন্দেহ ভঞ্জন, সাধুচরিতে সন্দেহ করা উচিত নহে, মহাপ্রভুর উপদেশ ।

২০৭—২১৩

ত্রিংশ অধ্যায় ।

নীলাচলে পুনর্ঘাট্রা, কমলপুরে দুই প্রভুর মিলন, মহাপ্রভুর স্তুতি, দুই প্রভুর কথা, নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কারের স্বরূপ ব্যাখ্যা ২১৪—২১৮

একত্রিংশ অধ্যায় ।

নিত্যানন্দ প্রভুর জগন্নাথ দর্শন, গদাধর-গৃহে গমন, দুই প্রভুর ভোজন ।

২১৯—২২১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

বিদায় বার্তা, লীলা রহস্য, ভক্তগণের বিদায় গ্রহণ, গোড়দেশ যাত্রা ।

২২২—২২৬

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় ।

নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ, বিবাহের প্রস্তাব, স্বর্ঘ্যদাসের স্বপ্নবৃত্তান্ত বসুধার যুদ্ধ, আকস্মিক বিপদের কারণ, নিত্যানন্দের বড়ভূক্ত্যুত্তি

ଧାରଣ, ବୈଦିକ ସଂସ୍କାରେ ଉପନୟନ, ସୁଗଳ ମିଳନ, ଜାହ୍ନବା ଦେବୀଙ୍କେ
ଯୌତୁକ ସ୍ବରୂପେ ଗ୍ରହଣ । ୨୨୭—୨୩୭

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରୁ ଅନନ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ, ଓ ବଡ଼ଭୂଜୟୁକ୍ତି ଧାରଣ,
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରୁ ସଂବରଣ । ୨୩୭—୨୩୯

ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଶ୍ରୀପାଟ ଶ୍ରୀଦେବେ ଗମନ, ବୀରଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରୁ ଜନ୍ମ, ଏ ବାଳକ ସହଜ ମନୁଷ୍ୟ
ନହେ, ଅଭିରାମେ ବୀରଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ, ଅଦୈତ୍ୟ ଶ୍ରୀରୁ ଆଗମନ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀର
ଜନ୍ମ । ୨୪୦—୨୪୧

ଷଟ୍ ତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ନାଳାବସାନ, ଶ୍ରୀଦେବେର ଶ୍ରୀଗ୍ୟାକାଶେ ବିବାଦ ଯେବେର ଯୁକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦାୟ ।

୨୪୨—୨୪୩

ପରୀକ୍ଷା ।

ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ-ଶାଖା ଓ ଶିଷ୍ୟ ଶାଖା ।

୨୪୪

উৎসর্গ পত্র ।

দেব শ্যামসুন্দর !

অঁস্তু অনন্তের জ্ঞান প্রকটিতে নাথ,
নিরাকারে সাকারের অমিয় প্রপাত,
স্বজিছেন পিতৃদেব, তব রূপ রাশি ;
জ্ঞানাভীত অসীমের অসীমত্ব নাশি ।
ক্ষুদ্র নর তব তার জানে নাই কভু,
প্রতিনিধি রূপে ছিলে জগতের প্রভু ।
সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ মাখি,
পরোক্ষেতে আত্মতত্ত্ব গুপ্তভাবে রাখি ।
পিপাসা সম্বল দিয়ে জীবনের পথে,
অকালে পশেছ হায় অমর পুরেতে ;
অগণ্য-অনন্ত ঋণে জড়িত তনয়,
কিবা দিবে প্রতিদান তার বিনিময় ?

তবে— জানি দেব, আদরের মিলাই-চরিত,
বহিত তোমার বুকে পীযুষ-সরিৎ ;
তাই তাত, করে ঢেলে দিতে সুধাধার,
দাঁড়ায়ে তোমার “যপি” লও উপহার ।

প্রণত পুত্র

শ্রীপ্রসূকার ।



নিত্যানন্দ-চরিত ।

নিরঞ্জনঃ নিত্যমনস্ত রূপং,
ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহং বৈ ।
ঈশাবতারং পরমেশ মীড়াম্
তং নিত্যানন্দং শিরসানমামঃ ॥

প্রথম অধ্যায় ।

জন্মে ও শৈশবে ।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষদিগের লীলা-
ক্ষেত্র । যুগে যুগে মহাপুরুষগণ ভক্তগ্রহণ করিয়া এই
পুণ্যক্ষেত্র কৃতার্থ করিতেছেন । যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবন-
চরিত আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার সুনাম ভারতবর্ষের
প্রায় সর্বত্র সুপরিচিত । তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে ভক্ত-হৃদয় অতুত-
পূর্ব ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয় । মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবন-চরিত

আলোচনা করিলে পুণ্য লাভ হয়, এজন্ত যিনি ধর্ম-বিপ্লবের সময় বাল্যায় অবতীর্ণ হইয়া ধর্মবীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং অধম জীবগণের গুরু-হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছেন,—আমরা সেই বৈষ্ণবগণের শীর্ষস্থানীয় ধর্মপ্রাণ অনন্তাবতার মহাত্মা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মধুর জীবন-চরিত বঙ্গীয় পাঠকদিগের করকমলে উপহার দিবার কামনা করিয়াছি। নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত আলোচনা করিবার পূর্বে তিনি যে দেশে, যে জাতিতে ও যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার মধ্যে মৌরেশ্বর থানার অধীন একচাকা নামক একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামে ওঝা উপাধিধারী এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। ইহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসায় অর্থাৎ যজ্ঞন, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। এই পরিবারেই শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হয়। এই গ্রামের অস্তিত্ব এখন লুপ্তপ্রায়, তথায় যাইতে হইলে লুপলাইনে মল্লার-পুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। একচাকা গ্রাম উক্ত ষ্টেশন হইতে অধিক দূরবর্তী নহে, একচাকা বক্রেস্বর গ্রামের নিকটবর্তী; তথায় বক্রেস্বর নামে একটা শিবের মন্দির আছে। পুরাকালে পাণ্ডবগণ যখন বনবাসে গমন করেন, তখন তাঁহারা কিছুদিন উক্ত গ্রামে জট্টনৈক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন এবং কয়েকজন অনুরকে বধ করেন। এই গ্রামের একচক্রেস্বর শিব-পার্কতীর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। পূর্বকালে এই গ্রামটী অত্যন্ত উন্নতিশীল ছিল এবং তথায় নানাপ্রকার সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। সর্কদাই সংস্কৃতির চর্চা হইত। প্রবাদ আছে জট্টনৈক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, “এই একচাকা গ্রামে বলরামের অবতার হইবে, কিন্তু আমি অন্মায়ুঃ আমার

ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ঘটবে না।” ফলতঃ যথা সময়ে এই ভবিষ্যৎ বাণী কার্যে পরিণত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভু যে পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন, সেরূপ ধর্মনিষ্ঠ পরিবার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বহুতঃ বহুদিন পূর্বে এই পরিবারে যে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নিত্যানন্দের জীবনে তাহা বহুক্ষু বৃক্ষরূপে সম্যক পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। নিত্যানন্দের পিতামহ সম্পত্তিশালী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার নাম সুন্দরামল বাঁড়ুরী।

“অতি অর্থবস্ত্র ওঝা প্রধান সর্ববাংশে ।

যজ্ঞমানে স্নেহ তাঁর অশেষ বিশেষে ॥

পূর্ব ঋষি প্রায় সে সকল ক্রিয়া তাঁর ।

বিপ্রেয় লক্ষণ যত তাঁহাতে প্রচার ॥”

ইহঁারা রাঢ়ীশ্রেণীর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহঁদের খ্যাতি ওঝা ও গাঁই সুন্দরামল বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও ইহঁারা কুলমর্যাদায় ততদূর উচ্চস্থানীয় নহেন, কিন্তু তথাপি ধন-গৌরবে ও চরিত্রগুণে নিত্যানন্দের পিতামহ সর্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

আজকাল নিত্যানন্দ প্রভুর বংশগত মৌলিকতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোচনা করিতে দেখা যায়। নিত্যানন্দের পিতামহের নাম সুন্দরামল বাঁড়ুরী, পিতার নাম হাড়াই ওঝা, নিত্যানন্দ বংশধরগণ বর্তমান সময়ে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী (বড়াল) বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; স্মরণ্য এ সম্বন্ধে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত হওয়াও অসম্ভব নহে।

যাহা হউক এ বিষয়ে আমরা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিলাম। ভরসা করি

ইহার আত্মপূর্বিক বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠকগণের সন্দেহ দূর হইবে।

নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুরী, অসমদেশে বন্দ্যঘাটা গ্রামী (গাঁই) ব্রাহ্মণগণ কোলীভদ্র হইয়া বংশজন্ম লাভ করিলেই তাঁহার বাড়ুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু সুন্দরামল্ল বাড়ুরী সে শ্রেণীর বংশজ ছিলেন না, তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সন্দিগ্ধ শ্রোত্রীয় সিন্দুরামল্ল গ্রামী (গাঁই) ব্রাহ্মণ ছিলেন। “ওঝা” তাঁহাদের কোলিক উপাধি নহে। সাধারণতঃ লোকে হাড়াই পণ্ডিতকে ওঝা বলিয়া ডাকিত।

নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমতঃ সিন্দুরামল্ল বন্দ্যঘাটা গ্রামী ছিলেন, কিন্তু তৎপরে জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত বহুদিন তীর্থপর্যটন করাতে সাধারণ লোকে তাঁহাকে সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিত। সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে জাতিনাশ ঘটে; এইজন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে পুনরায় তাঁহার সংস্কার করাইয়া বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন।

তারপর বীরভদ্র প্রভুর জন্ম হইলে কুলাচার্য্যগণ তাঁহাকে পূর্বোক্ত গাঁইর পরিবর্তে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী (গাঁই) বলিয়া প্রচার করেন। যদিও নিত্যানন্দ প্রভু ভগবচ্ছক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে নিষেধ বা বিধি কিছুই আবশ্যকতা নাই; কিন্তু তথাপি লৌকিক জগতে শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা নিমিত্তই কুলাচার্য্যগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। যথা:—

“নিতাই তনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।

স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার ॥

সিন্দুরামল্লক গাঁই আছিল নিতাই ।

অবধোঁত কল্লতরু বন্দ্যবংশ গাঁই ॥

বংশ গাঁই হ'লে করি কুল অপচয় ।

উদাসীন হ'লে কভু জাতি নাহি রয় ॥

উভয় বর্জনে বীর শঙ্কেত হইল ।

কুলাচার্য বটব্যাল রটনা করিল ॥”

কুলকল্লতরু ।

“কশ্চিৎ বড়ালঃ, কশ্চিৎ সিন্দুরামল্ল বন্দ্যঃ,

ইতি দ্বিধাতো বীরভদ্রী শঙ্কেতঃ ॥”

তদবধি বীরভদ্র প্রভুর সন্তানগণ আপনাদিগকে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন; কিন্তু হাড়াই পণ্ডিতের অজ্ঞাত বংশের সন্তানগণ (যাহারা বর্তমান সময়ে রাঢ়দেশে বাস করিতেছেন) তাঁহারা স্নন্দরামল্ল বাড়ুরীয় সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন ।

স্নন্দরামল্ল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় করিতেন; কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান তাহাতে মাত্রই ছিল না। কখনও অধর্ম্মাচরণ করিয়া ধনলাভের প্রয়াসী হইতেন না। তাঁহার ধর্ম্মকার্য্য সকল বিশ্বাস ও ভক্তিমূলক ছিল। এজন্য সকলে তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিত। সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি ঈশ্বর চিন্তায় কখনও বিব্রত থাকিতেন না।

পৃথিবীতে অবিমিশ্রসুখ দুর্লভ। যদিও ওঝা সকল বিষয়েই সুখী ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার একটা প্রধান মানসিক কষ্ট এই ছিল যে, সন্তান হইয়াই মরিয়া যাইত। এই হুঃখে তিনি সর্বদাই ক্ষুণ্ণ থাকিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা রজনী-

যোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে, জনৈক মহাপুরুষ তাঁহার নিকট আবিভূত হইয়া বলিতেছেন যে, ‘বৎস! তুমি অনর্থক চিন্তা করিও না, অতি সত্বরই তোমার একটা পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্রদ্বারাই তোমার বংশ উজ্জ্বলীকৃত হইবে।’ এই স্বপ্ন দেখিয়া ওঝা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, রাত্রিতে আর ঘুমাইলেন না। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হইল। পুত্র হইয়াই মারা যাইত, এজন্য এই পুত্রটিকে পার্বতী ও শঙ্করের নিকট সমর্পণ করিলেন এবং তাহিল্য প্রকাশ করিয়া পুত্রের নাম ‘হাড়াই’ রাখিলেন। ইহার অপর নাম মুকুন্দ।

নিম্নোক্ত শ্লোকেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা:—

“তথা পদ্মাবতী শ্রীল মুকুন্দো দ্বিজসন্তমো।

নিত্যানন্দ স্বরূপস্ত পিতরা বতুল শ্রিয়ৌ ॥”

বৈষ্ণব-বিধান।

হাড়াই ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিলেন এবং পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতার একটা পুত্র বিশেষতঃ বড়ই আছরে, এজন্য ওঝা নিকটস্থ এক গ্রামে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলা পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে হাড়োর পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। হাড়ো মহা সমারোহের সহিত তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হাড়ো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার বিত্তাবস্থা ও সচ্চরিত্রতায় সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দিকে বিকশিত হইয়া পড়িল।

“সর্বশাস্ত্রে হাড়ো ওঝা হইলা পণ্ডিত।

হাড়াই পণ্ডিত নাম হইল বিদিত ॥”

প্রথম অধ্যায় ।

হাড়াই পণ্ডিতের পত্নী পদ্মাবতীও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও ভক্তিমতী ছিলেন। খণ্ডর শাণ্ডীীর মৃত্যুর পরে সংসারের ভার স্বন্ধে পতিত হইল; কিন্তু তিনি সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকিলেও ভগবচ্ছিত্তা হইতে কখনও বিরত হইতেন না। পতির প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। ব্রত, পূজা, আতিথ্য, উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মানুমোদিত কোন কার্যেই তাঁহার আলস্য ছিল না। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে তিনি বিশেষ ভক্তি করিতেন। কেহ কেহ অহুমান করেন যে, হাড়াই পণ্ডিত শাক্ত ছিলেন, কিন্তু নিয়োক্ত শ্লোক দ্বারা একরূপ নিশ্চিতরূপে অহুমান করা যায় যে, হাড়াই পণ্ডিত এবং তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী উভয়েই বৈষ্ণব ছিলেন।

“অনন্ত বৈষ্ণব বিষ্ণু-ভক্তি তত্ত্ব জ্ঞাতা ।

পরম বৈষ্ণবী তাঁর পত্নী পতিব্রতা ॥

সে দৌহার চরিত কহিতে সাধ্য নয় ।

জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয় ॥

প্রশংসে সকলে দেখি অতি শুদ্ধাচার ।

অতি প্রীত বিষ্ণু আরাধনায় দৌহার ॥”

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। পদ্মাবতীর গর্ভে সন্তান হয় না দেখিয়া হাড়াই পণ্ডিত কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। যদিও সাংসারিক কার্যে এবং ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন বটে; কিন্তু তথাপি যেন কি রকম একটা অশান্তিতে সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। এ ১৩৯৫ শকের কথা। এই সময় পদ্মাবতী একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে “বৎসে! তোমার বহুপুণ্যের ফলে ভগবান্ পাণিগণের উদ্ধারের

জগৎ পুত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।” পদ্মাবতী এই সুস্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত উল্লাসিতা হইলেন । সে রাত্রিতে আর ঘুমাইলেন না । পর দিবস হাড়াই পণ্ডিতের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন । এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পতিপত্নী উভয়েই যুগপৎ হর্ষোৎফুল্ল হইলেন । ইহার কিছুদিন পরে পদ্মাবতীর গর্ভ হইল । গর্ভাবস্থায় হাড়াই পণ্ডিত নানাপ্রকারে পদ্মাবতীর মনোহাতিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন । দশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি সন্তান হয় না দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইলেন । অবশেষে ১৩২৫ শকাব্দের মাঘ মাসে শুভ-শুক্রায়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ প্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন । তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অমঙ্গল দূর হইল, একচক্র গ্রামের সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল ।

“তের শত পঁচানববই শকে মাঘ মাসে ।

শুক্রায়োদশীতে রামের পরকাশে ॥”

(অধৈত প্রকাশ)

পুত্রমুখ দর্শন করিয়া ওঝাদম্পতীর আনন্দের সীমা রহিল না, যে প্রকার শশধর দর্শনে মহাসাগরের জল উচ্ছলিত হইয়া তীরস্থ ভূমিকে প্রাবিত করে, সেই প্রকার নব-প্রসূত শিশুর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া হাড়াই পণ্ডিতের হৃদয়-কন্দর অপরিমিত আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল । একে নিতাই হাড়াই পণ্ডিতের প্রথম পুত্র, তাহাতে অল্পপম রূপ, ইহা দেখিয়া পতিপত্নী উভয়েই আনন্দে বিতোর হইলেন ।

নিত্যানন্দের ভুবনমোহন রূপে স্ততিকাগৃহ আলোকিত হইল, যে দেখিল সেই তাঁহার অল্পপম রূপমাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইল, সকলেই বলিতে লাগিল, এরূপ ছেলে আমরা কখনও দেখি নাই । দিবাকরের

অগ্ন্যবেশে! চন্দ্রমা যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, হাড়াই পণ্ডিতের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া নিত্যানন্দও সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের আকৃতিটা অতি সুন্দর, গায়ের রং কাঁচা সোণার-তায়, দেহ লাবণ্যময়, চক্ষু দুইটা আকর্ষণ বিস্তৃত, মুখ সর্বদাই হাস্যময়, দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের পক্ষে এ প্রকার রূপ অসম্ভব, ইহা দেখিয়া পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিত। যে দেখিত সেই একবার কোলে না লইয়া ছাড়িত না। ক্রমশঃ নিতাই হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন। কোল হইতে নামাইয়া দিলেই কোথায় যাইবেন তাহার ঠিক নাই, এ দিক ও দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শিশুটা পিতামাতার বড়ই আদরের ছিল, এজন্ত তাঁহার প্রতি সকলেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে হাড়াই পণ্ডিত পুত্রের অন্নারস্ত দেওয়ার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে নিতাইর অন্নারস্তের যোগাড় করিলেন। পুত্রোৎসবে ওঝার বাড়ীতে অনেক আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হইল। আত্মীয়গণ সকলেই নব-প্রসূত শিশুর মুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নিতাই যেন সকলেরই পূর্বপরিচিত, যিনি শিশুটাকে একবার কোলে লইতেছেন, তিনি আর কোল হইতে নামাইতেছেন না, ছোট বড় সকলেই তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে যথাকালে নিতাইটাদের অন্নারস্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর নাম করণ হইল। প্রথমতঃ নিতাইকে সকলে ‘কুবের’ বলিয়া ডাকিত, তৎপর অন্নারস্তের পর হইতে ‘রাম’ ও ‘নিত্যানন্দ’ এই দুইটা নামেই প্রায় সকলে তাঁহাকে ডাকিত।

ক্রমশঃ নিতাই হাঁটিতে শিখিলেন। নিতাই সর্বদাই ধূলাখেলায় মত্ত থাকিতেন, এজন্ত পদ্মাবতী অনেক সময় তাঁহাকে ভৎসনা

করিতেন ; কিন্তু নিতাইর সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তিনি সুযোগ পাইলেই দৌড়িয়া গিয়া খেলার সাথীগণের সহিত মিলিতেন । পদ্মাবতী যত্নপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া ধূলা মুছাইয়া দিতেন, নিতাই আবার যাইয়া অমনি ধূলা মাখিতেন । কিন্তু নিতাইএর দেহ ধূলি-বুসরিত হইলেও তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইত না, বরং এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইত । এক এক দিন স্নান করিবার সময় পদ্মাবতী নিতাইর গাত্রে হলুদ মাখাইয়া দিতেন ; কিন্তু যাহার গায়ের রং স্বভাবতঃই কাঁচা সোণার তায়, তাঁহার আর হরিদ্রাতে অধিক সৌন্দর্য্য কি হইবে ?

“পুত্রের রূপের লাগি হরিদ্রা মাখায় ।

হরিদ্রা বিবর্ণ হয় সে অঙ্গচ্ছটায় ॥”

নিতাইর বয়স ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন খেলায় মত্ত হইতে লাগিলেন । মাতার ইচ্ছা যে পুত্র বাড়ীতে থাকিয়া ঘরে বসিয়া খেলা করে, কিন্তু নিতাই তাহা করেন না ; নিতাই পাড়ায় যাইয়া বালকদের সহিত মিশিয়া ধূলাখেলা করেন । অনেক সময় পদ্মাবতী নিজেই পাড়ার বালকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খেলা করিতে দিতেন । পাড়ার বালকগণও নিতাইএর অত্যন্ত বাধ্য হইয়া-ছিল, নিতাইর নাম শুনিবামাত্র তাহারা দৌড়িয়া আসিত । এবং সকলেই যেন মস্তমুগ্ধবৎ হইয়া যাইত । নিতাই বাহা বলিতেন তাহারা বাঙ্‌নিশ্চিন্ত না করিয়া তাহাই করিত । শৈশবকালে নিতাই অত্যন্ত শাস্ত ছিলেন, এ সম্বন্ধে প্রমাণও পাওয়া যায় । যথা :—

“করিলেন খেলা আরম্ভ নিত্যানন্দ ।

পরম সুবুদ্ধি চাক্ষুস্যের নাই গৃহ ॥”

(ভক্তি-রত্নাকর)

যখন নিতাই পাড়ায় যাইতেন, তখন পদ্মাবতী তাঁহাকে লালপেড়ে নীলাম্বরী (“রক্তপ্রাস্তনীল পটু ধড়া”) পরাইয়া কপালে কাঁলীর ফোঁটা দিয়া দিতেন । তখন নিতাইএর অপূর্ব সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত ।

নিতাইএর খেলারও বিশেষত্ব ছিল । প্রায় বালকগণ যেক্রপ ভাবে বাল্যকালে ক্রীড়া করে, নিতাই সেইরূপ খেলাইতেন না । নিতাই ক্রীড়াচ্ছলে ভগবানের মধুর লীলার অভিনয় করিতেন । নিত্যানন্দ যে শ্রীভগবানের অবতার তাহা তাঁহার শৈশব ক্রীড়া দৃষ্টেই সাধুগণ অস্বপ্নমান করিতেন । একদিন নিতাই বালা-সখাদিগকে লইয়া দেবসভা করিলেন । কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহেশ্বর হইলেন । কোন বালক গান করিতেছে, কেহ স্তব করিতেছে, কেহ মন্ত্র পাঠ করিতেছে । এমন সময় একজন বালক স্ত্রীলোকের বেশে সজ্জিত হইয়া সেখানে আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া কহিল ; “হে দেবগণ ! আমি পৃথিবী, দৈত্যগণের উৎপীড়নে বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, এখন আর আমি এই কষ্ট সহ করিতে পারিতেছি না, আপনারা আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন ।” দেবগণ সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে জাগাইতে না পারিলে আর পৃথিবীর ভার কমিবে না । তখন সকলে নদীর তীরে গমন করিয়া নারায়ণের স্তব আরম্ভ করিলেন । নিতাই পূর্ব হইতেই বালকদিগকে অতি স্নেহভাবে শিখাইয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহার নিতাইএর আদেশানুসারে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল । একটা বালক পূর্বেই গাছে উঠিয়া লুকাইয়া ছিল, সে তথা হইতে দৈববাণী করিল, “দেবগণ ! ব্যস্ত হইও না, আমি শীঘ্রই মথুরায় যাইয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং দৈত্যগণের হস্ত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিব ।” পরে ব্রহ্মনীতে বসুদেব ও দৈবকীর বিবাহের অভিনয় হইল । তাহার

পর দিবস শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা । বালকদিগের মধ্যে কেহ কৃষ্ণ, কেহ দৈবকী, কেহ বশুদেব এবং কেহ কংস সাজিলেন । বশুদেব এবং দৈবকী কংসের ভয়ে ভীত । ভেরেণ্ডা গাছ দিয়া কংসের কারাগৃহ প্রস্তুত হইল । গভীর রজনীতে রক্ষিগণ নিদ্রিত হইলে বশুদেব পুত্রকে নন্দদ্বোষের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তথা হইতে মহামায়াকে আনিলেন ! দৈবকীর এই গর্ভের সন্তান কংসকে বিনাশ করিবে, এই ভয়ে কংস শিশু মহামায়াকে হত্যা করিতে উত্তত হইলে, জনৈক বালক দূরে থাকিয়া দৈববাণী করিল, “তোমাকে মারিবে যে গোকুলে হ’য়েছে সে ।” এইরূপে কংসকে ভুলাইয়া যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে রক্ষিত হন, তাহা সমুদয় শেষ হইল । ইহার পরে ব্রজলীলার অভিনয় আরম্ভ হইল । একটা বালককে পুতনারাক্ষসী রূপে সাজান হইল এবং আর একটা শিশু শ্রীকৃষ্ণ হইয়া পুতনার স্তন্য পান করিতে লাগিল । একদ্বিবস নল খাগড়ার একখানা গাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন । নিতাই মধ্যে মধ্যে গোয়াল-গৃহে যাইয়া মাখন চুরী করিয়া খাইতেন, ইহাতে গোপ-পত্নীগণ নিতাইএর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইত না, যদিও কোন দিন কেহ রাগ করিয়া নিতাইকে ধরিতে যাইত, কিন্তু নিতাইর সেই নিষ্ফল মুখচন্দ্র দেখিলেই তাহারা অমনি ভুলিয়া যাইত । একদিন নিতাই বলিলেন, “সখাগণ! অল্প কালীয় দমন অভিনয় করিতে হইবে।” তাহারা বলিল, “আচ্ছা তাহাই হইবে।” নিতাই তখন একটা বৃহৎ সর্প তৈয়ার করার জন্য উদ্যোগ করিলেন । বালকগণ এই নূতন ব্যাপারের নাম শুনিয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল ।

সকলে মহাবাস্তব হইয়া কেহ পাতা, কেহ দড়ি, কেহ আকড়া, যে যাহা পাইল তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল । তখন নিতাই লতা

পাতা দ্বারা একটি বৃহদাকারের সর্প প্রস্তুত করিলেন, এবং সকলে মিলিয়া সর্পকে নদীতে লইয়া গেল। নিতাই সর্পটীকে জলে ফেলিয়া দিলেন। বালকগণ সকলে কালায় দমন করার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

“কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।

জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥

ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেত হইয়া।

চৈতন্য করায় পাছে আপনে আসিয়া ॥

কোনদিন তাল বনে শিশুগণ লইয়া।

শিশু সঙ্গে তাল খায় ধনুক মারিয়া ॥”

(চৈতন্য ভাগবত।)

বালকগণ কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন নিতাই নিজে যাইয়া পুনরায় তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। একদিন সকলে মিলিত হইয়া তাল বনে প্রবেশ করিয়া তাঁর নিক্ষেপ করিয়া তাল পাড়িলেন, এবং উহা সকলে মিলিয়া আনন্দের সহিত খাইলেন। কোন দিন নিতাই শিশুগণ লইয়া দিবাভাগে বন ভোজন করিয়া পথিমধ্যে বকাসুর, অঘাসুর ও বৎসাসুর বধ প্রভৃতি অভিনয় করিতেন। একদা নিতাই বাঁশ দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্বত প্রস্তুত করিয়া বজ্র দ্বারা আবৃত করতঃ উহা নিজ হস্তে ধারণ করিলেন এবং অস্ত্রাঘ্র বালকগণ স্তব করিতে লাগিল।

কোনদিন শিশুগণকে গোপীবেশে সাজাইয়া ব্রজলীলার অভিনয় করিতেন। একদিন নিতাই বালকদিগকে কহিলেন, “অস্ত্র গোপিনা দিগের বজ্রহরণ, অভিনয় করিতে হইবে” বালকগণ শুনিয়া অত্য-

আনন্দিত হইল। কয়েকজন বালককে জীলোকের বেশে সাজাইয়া নিজে কৃষ্ণ সাজিলেন। নদীর তীরে নিতাই একটা বৃক্ষে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, এদিকে অগ্ৰাণ্ণ গোপীগণ জলে নামিয়াছে, কেহ বা বস্ত্র উপরে রাখিয়া জলে গিয়াছে, কেহ বা কলসী ডুবাইতে গিয়াছে, নিতাই এই সুযোগে তাহাদের বসন চুরি করিলেন; তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। আর একদিন কংসের রাজসভা করা হইল। একজন বালক বৃদ্ধ নারদমুনি সাজিয়া আসিল, কংস মহর্ষি নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া অক্রুরকে রাম কৃষ্ণ আনিবার জ্ঞাপ্ত ব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। অক্রুর ব্রজধামে আসিয়া রাম কৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় চলিলেন। পথিমধ্যে রজকের নিকট হইতে পরিধেয় বস্ত্র এবং কুজার নিকট হইতে সুগন্ধ গ্রহণ করতঃ চান্দুর, মুষ্টিক, কুবলয় ইত্যাদি বধ ও কংসবধ করিয়া বালকগণ আত্মলাভে অধীর হইয়া উঠিল। তারপর একদিন বামন হইয়া বলীকে ছলনা করিলেন।

“কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশু সঙ্গে।

সর্বলোক দেখে হাসে বালকের রঙ্গে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত।)

অগ্ৰ একদিন সেতুবন্ধের অভিনয় করিলেন। নিতাই নিজে লক্ষণ সাজিলেন, আর কয়েকজন বালক বামন সাজিয়া ভেরেণ্ডাগাছ কাটিয়া জলে সেতুবন্ধন করিতে লাগিল। বালকদিগের মধ্যে একজন সুগ্রীব সাজিলেন এবং লক্ষণের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পরশুরাম পরাজয়, মেঘনাদ বধ, লক্ষণ শক্তিশেল প্রভৃতি রাম লীলার অভিনয় করিতেন। একদিন লক্ষণ শক্তিশেলের অভিনয় কালে নিতাই স্বয়ং লক্ষণ সাজিয়াছেন, অপর একজন বালক রাবণ

সাজিয়া পদ্মপুষ্পের তোড়া দ্বারা শক্তিশেল নির্মাণ করতঃ লক্ষণকে বলিতে লাগিল “লক্ষণ ! আমি এই ভীষণ শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলাম, তুমি ইহা সংবরণ কর ।” এই বলিয়া পদ্মফুল দ্বারা নির্মিত শক্তিশেল নিতাইএর প্রতি নিক্ষেপ করিল, নিতাই অমনি শক্তিশেলের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষণের ভাবে চলিয়া পড়িলেন ।

“এতবলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া ।

লক্ষণের ভাবে প্রভু পড়িল চলিয়া ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

ইহা দেখিয়া অত্যাগ্ন বালকগণ নিতাইর মূর্ছা ভঙ্গের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নিতাইর চৈতন্য করিতে পারিল না । এই অমায়ুষিক ব্যাপার দেখিয়া বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ।

বালকগণের কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত দৌড়িয়া আসিলেন । আসিয়া দেখেন যে নিতাই অচেতনাবস্থায় পড়িয়া আছেন, ইহা দেখিয়া পদ্মাবতীও মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন ।

ক্রমে ক্রমে পাড়ার সকল লোক আসিয়া জড় হইল । নিতাইএর অবস্থা দেখিয়া সকলেই মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন । তখন একজন বালক বলিল “হনুমান ঔষধ দিলেই লক্ষণ ভাল হইবে ।” এই কথা শুনিয়া যিনি হনুমান সাজিয়াছিলেন, তিনি অমনি ঔষধ আনিতে গমন করিলেন । ইতঃপূর্বেই, পথিমধ্যে কোন্ বালককে রাক্ষস, কোন্ বালককে গন্ধর্ব্ব, এবং কাহাকেও কুস্তীর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল । হনুমান বাইতে বাইতে ক্রমশঃ তাহাদিগকে পরীক্ষণ করিয়া গন্ধমাদন পর্ত্ত মস্তকে করিয়া লইয়া আসিল । হনুমানকে দেখিয়াই অত্যাগ্ন

বালকগণ “জয় রাম” ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন অগ্র একজন শিশু বৈষ্ণবরূপে ঔষধ লইয়া নিতাইএর নাসিকার নিকটধারল, নিতাই অর্মান “জয় রাম” শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিল। হাড়াই পণ্ডিত তখন পুত্রকে কোলে লইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন এবং পুনঃ পুনঃ নিতাইএর মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। নিতাইএর এই প্রকার অমানুষিক বাল্যলীলা দর্শন করিয়া পাড়ার সকলেই চমৎকৃত হইত। এবং তাহারা আলোচনা করিত এ বালক মানুষ না দেবতা ?

কেহ কেহ বলিত নিতাই, তুমি এ সব কোথায় শিখিলে ? তখন নিতাই সহাস্ত্রে বলিতেন “এ সব আমার লীলা” ।

“হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা ।”

এইরূপে নিতাই বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলেন।





দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নিত্যানন্দের উপনয়ন ।

“নিত্যঃ শ্রীরাধিকা নাম আনন্দং কৃষ্ণং বিগ্রহঃ ।

তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম নিত্যানন্দোহভিধীয়তে ॥”

নিতাই ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিলেন, হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার শিক্কার বন্দোবস্ত করিতে যত্নবান হইলেন । নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে কাজেই প্রথমেই ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়া আরম্ভ করিলেন । নিত্যানন্দ খেলার সময় যেমন একাগ্রচিত্তে খেলা করিতেন, পড়িতে বসিলেও সেইরূপ অনগ্রাকৃষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন । নিতাই যেমন মেধাবী তেমনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন ।

“ব্যাকরণ আদিশাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ ।”

(ভক্তি রত্নাকর ।)

এই সময় হাড়াই পণ্ডিত মহাসমারোহের সহিত নিত্যানন্দের উপ-
নয়ন দিলেন । তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্য ও ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিয়া
সকলেই মুগ্ধ হইলেন । নিতাই দণ্ড হস্তে সন্ন্যাসিবেশে ভিক্ষা করিতে
বাহির হইলেন, প্রতিবেশিগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে নবীন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা
দান করিলেন ।

“কি আনন্দ হৈল যজ্ঞোপবীত সময় ;
যে শোভা দেখিনু তাহা কহিলে না যায় ।”

(ভক্তি রত্নাকর ।)

নিত্যানন্দ ক্রমশঃ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ।
তিনি অচিরেই সর্বতোমুখী প্রতিভা ও সুশীলতা দ্বারা অধ্যাপকের
অনুগৃহীত এবং সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাত্মক ও প্রণয় ভাজন হইয়া
উঠিলেন । তাঁহার যেমন একাগ্রতা তেমনি অসাধারণ প্রতিভা
কাজেই অধ্যয়নের ফলও অতি চমৎকার হইল । বস্তুতঃ ক্রিয়া সং-
পাত্রে গুপ্ত হইলেই সুফলপ্রদ হয়, অসংপাত্রে গুপ্ত হইলে কখনও ফল-
প্রদ হয় না । যথা :—

“ক্রিয়া হি বস্তুপহিতা প্রসীদতি ।”

(রঘুবংশম্ ।)

অধ্যাপক, নিতাইর পাঠোন্নতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ।
অল্পকাল মধ্যেই তিনি বিবিধ বিজ্ঞায় পারদর্শী হইলেন, ষাটশ বৎসর
উত্তীর্ণ না হইতেই নিতাই পণ্ডিত সমাজে খ্যাতনামা হইয়া উঠিলেন ।
অধ্যাপক নিতাইর অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
“জায় চূড়ামণি” উপাধি প্রদান করিলেন । নিতাইর যশঃ-সৌরভ
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ।

“শ্রায় চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি ।

নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি ॥”

(অদ্বৈত প্রকাশ ।)

ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হরিনাম প্রীতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । যেখানে হরিসংকীৰ্ত্তন শুনিতে পাইতেন, নিতাই অমনি প্রেমে বিভোর হইয়া তথায় দৌড়িয়া যাইতেন । তাঁহার কীৰ্ত্তন শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত । নিতাই যে উত্তরকালে একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন, ইহা তাঁহার বাল্য জীবনেই স্মৃতিত হইয়াছিল ।

এ ১৪০৭ শকের কথা ; এই সময় শুভ ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশতি দিবসে চন্দ্রগ্রহণের দিনে পতিতপাবন শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলেন । সুধাকরের বিমল জ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইল, চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, সুখ-সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, নবদ্বীপ বাসিগণ উচ্চকণ্ঠে হরিশ্রবণ করিয়া উঠিল, নবদ্বীপ চন্দ্রের বিমল জ্যোতিঃ জগন্নাথ মিশ্রের আলয় আলোকিত করিয়া সমস্ত নবদ্বীপ ছড়াইয়া পড়িল, ভক্তগণ মহানন্দে হরিশ্রবণ করিতে লাগিল । জগদানন্দের আবির্ভাবে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, সকলেরই হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস । এই মহানন্দের দিনে বালক নিত্যানন্দের হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । নিতাই বালক, তাঁহার এক্রপ আনন্দের কারণ কি ? এক্রপ হর্ষোচ্ছ্বাস তো আর তাঁহাতে কখনও দেখা যায় নাই, তবে কি তাঁহার প্রাণাধিক নিমাইর জন্ম বিবরণ তিনি জানিতে পারিয়াছেন ? নতুবা এক্রপ মন্ততার কারণ কি ? নিতাই থাকিয়া থাকিয়া গভীর হৃদয় করিতেছেন কেন ? সেই গগন-স্পর্শী হৃদয়ে যেন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, সাধারণ লোকে

ইহার মর্শ্ব বুঝিতে না পারিয়া নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল । কেহ বলিল “এ বজ্রনির্ঘোষ” কেহ বলিল “মোড়েশ্বর দেবের গর্জন-ধ্বনি” কিন্তু নিত্যানন্দের হৃদয় কেহই অনুধাবন করিতে পারিল না ।

“যে দিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র ;

রাঢ়ে বসি হৃদয় করিলা নিত্যানন্দ ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হৃদয়,

কত লোকে বলিলেক হইল বজ্রপাত ।

কত লোক বলিলেক জানি সে কারণ,

মোড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জন ।”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দ সর্বদর্শী, কাজেই তাঁহার জানিতে কিছুই বাকী নাই । যাঁহার জন্ম তিনি এতদিন ব্যাকুল ছিলেন, আজ সেই শ্রীগৌরানন্দের আবির্ভাব জানিতে পারিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন ।

এই সময় নিত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বৎসর কিন্তু বয়স কম হইলেও তাঁহাকে বড় দেখাইত । সকলেই তাঁহাকে প্রায় ষোড়শ বৎসরের বলিয়া অনুমান করিত । ইহার কিছুকাল পরে নিতাইর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল । সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি নাই, তিনি সর্বদা নির্জনে বসিয়া চিন্তা করেন এবং হরিনাম গান করেন । পুত্রের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ওঝা দম্পতী কিছু চিন্তিত হইলেন । একদিন পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিতের নিকট নিতাইটাদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন । হাড়াই পণ্ডিতও তাহাতে সন্মত হইলেন । প্রতি-বাসী এবং আত্মীয়গণ সকলেই বিবাহের প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করিলেন । কিন্তু নিত্যানন্দ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিব্রত

হইলেন । তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, মাতা পিতা জোর করিয়া সংসারাবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, এখন কেমন করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, কি প্রকারে মমতা-শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া পলাইবেন, নিত্যানন্দ নির্জনে বসিয়া সৰ্কদা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন । সংসার যেন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশান্তিকর হইয়া উঠিল । এই সময় সহসা একটা মর্মান্বদ ঘটনা সংঘটিত হইল ।

একদিন নিতাই হঠাৎ বলরাম ভাঁবে বিভোর হইয়া হুঙ্কার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, ইহা দেখিয়া পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । পুত্রের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ কি ? কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না । গ্রামের সকলকে ডাকিলেন, প্রতিবাসী-রাও কিছুই ঠিক করিতে পারিল না । সংজ্ঞা লাভের জন্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । অবশেষে বহুক্ষণ পরে নিতাইর চৈতন্য হইল । এই সমুদয় অমানুষিক ভাব দেখিয়া পদ্মাবতী বলিলেন “নিতাই, তোর এ ভাব হইল কেন ?” তখন নিতাই বলিলেন “মা, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন কোন মহা-পুরুষের সহিত তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছি । ইহার পরে কি হইয়াছে জানি না ।” ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন । নিত্যানন্দের লীলা বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই ।

“বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে ।

চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিতাই কলিযুগে পাপিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি অন্তর্ধামী, তাঁহার দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত ; এ দিকে

নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন ? এখন কিরূপে দুই মহাশক্তির মিলন হইবে, কিরূপে দুই ভাই একত্র হইবেন, এই চিন্তাতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর, একদিন একটা সন্ন্যাসী হঠাৎ হাড়াই পণ্ডিতের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । সন্ন্যাসীর উজ্জল গৌরবাস্তি, আজ্ঞামূলস্থিত বাহু, উন্নত বলিষ্ঠ শরীর, মস্তকে দীর্ঘ জটাকলাপ, তেজোদৃষ্ট বদন, ভুবন ভুলান রূপ, দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে অমাব্যুখিক প্রভা বিছাড়েগে বাহির হইতেছে । হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া বসিতে দিলেন ও নিজে জল আনিয়া পদ প্রক্ষালন করিলেন । এদিকে নিতাই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন, তাঁহার সর্বঙ্গ পুলকিত হইয়াছে । তিনি অমনি দৌড়িয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন । প্রণাম করিতেই নিতাইর শরীর পুলকিত, কম্পিত এবং নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল । অমনি সন্ন্যাসী তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে লইলেন । নিতাইর মুখে সারল্যের হাসি, সহিষ্ণুতার কোমল দীপ্তি ও প্রতিভার উজ্জল আভা যেন লাগিয়াই আছে, ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সে রাত্রিতে সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহেই অবস্থান করিলেন । রজনীযোগে সন্ন্যাসীর সহিত হাড়াই পণ্ডিতের মধুমাধা কৃষ্ণ কথার আলোচনা হইল । অবশেষে প্রাতঃকালে প্রসঙ্গাধীন সন্ন্যাসী বলিলেন “পণ্ডিত, তোমার নিকট আমার একটা ভিক্ষা আছে ।” তখন হাড়াই পণ্ডিতের নিত্যানন্দের পূর্ব স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল । তিনি অমনি রুদ্ধকণ্ঠে ভীতি ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন “যে আজ্ঞা হয় দাসকে বলিয়া কৃতার্থ করুন ।”

“ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার ।

নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার ॥

ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন ।

সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥

এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার ।

কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥”

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন “আমি তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়াছি, আমার সঙ্গে আর কেহ নাই, তোমার যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আছে, এই বালকটাকে কতকদিনের জন্ত আমার সঙ্গে দাও । আমি ইহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিব, এবং সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করাইব ; ইহার জন্ত তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না” । এই কথা শুনিয়া হাড়াই পণ্ডিত চিন্তিত হইলেন, যাঁহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, যাঁহাকে তিল-মাত্র না দেখিলে অস্থির হন, এমন কি নিতাই যাহার সর্বস্বধন কেমন করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিবেন এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । কি করা উপায় নাই, একদিকে সন্ন্যাসী বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না, অন্যদিকে প্রিয়তম পুত্রের মমতাও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এই বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া তিনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইলেন । পুনরায় নিজে নিজেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি সন্ন্যাসীকে পুত্র না দিই তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে । বিশেষতঃ আমরা ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে পুরাকালে মহাপুরুষগণ অনেকেরই পুত্ররত্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন । রামচন্দ্র রাজা দশরথের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন, কিন্তু যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন রাজা অগ্নান চিত্তে রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র-করে

অর্পণ করিয়াছিলেন। আমারও আজ সেইরূপ ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে, যাহা হউক আমিও তাঁহাদের পথানুসারী হইব। এই সমুদয় বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার পত্নীর নিকট গমন করিলেন। এবং তাঁহার নিকট আনুপূর্বিক সমুদয় বিবরণ বলিলেন। পদ্মাবতী সাতিশয় ধর্ম পরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন, তিনি এই সমুদয় ঘটনা শুনিয়া বলিলেন “আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করুন। আপনার মতেই আমার মত জানিবেন।” এই কথা শুনিয়া হাড়াই পণ্ডিত পুনরায় সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন এবং অবনত মস্তকে নিতাইকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

“আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।

ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোড়াইয়া মাথা ॥”

পুলকে ভিক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু হাড়াই পণ্ডিত এই অমানুষিক কার্য সম্পন্ন করিলেন।

নিতাই মায়ের কোল শূন্য করিয়া চলিলেন। সংসারের শোক দুঃখ যাঁহাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করে নাই, এরূপ একটা স্নানর বালক আজ দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সহচর হইলেন।

সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। নিতাই বালক, একাকী বাইয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিবার সম্ভাবনা নাই, তাই আজ ভগবানের ইচ্ছাতেই সন্ন্যাসী পথ প্রদর্শক হইয়া নিতাইর সহিত মিলিলেন। হাড়াই পণ্ডিত যদিও নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু নিত্যানন্দকে ছাড়া অবধি তিনি যেন একরূপ উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। মনকে কিছুতেই স্থির করিতে পারেন না, অপত্যস্নেহের এমনই শক্তি যে মানুষের মনুষ্যত্ব পর্যাস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। পৃথিবীতে সন্তানের জায় প্রিয় বস্তু মাতা পিতার নিকট

আর দ্বিতীয় নাই, আজ সেই প্রিয়তম পুত্র সন্ন্যাসীকে দিয়া হাড়াই পণ্ডিত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, হৃদয়ে শোকের ঝড় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না । পুত্র শোকের তীব্র-যন্ত্রণায় সংসার যেন তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইতে লাগিল । পদ্মাবতীও পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া উঠিলেন । ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার কাতর ক্রন্দনে শত শত পাষণ্ড হৃদয় বিচলিত হইল । এইরূপে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী তিন মাস পর্য্যন্ত পুত্রশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে কাটাইলেন । অবশেষে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কতকটা আশ্বস্ত হইলেন । নিত্যানন্দও মাতা পিতার মমতা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থপর্যটন করিতে লাগিলেন । যদিও পিতা মাতার জ্ঞাত কিছুদিন মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিকদিন স্থায়ী হইল না । কারণ নিত্যানন্দের যে কষ্ট তাহা লৌকিক শিক্ষামাত্র, বাস্তবিক তিনি সুখ দুঃখের অতীত, আনন্দময় কোষে বিরাজমান । আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । মহাপুরুষগণ যুগে যুগেই এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া লোক শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন । বলা বাহুল্য অতীতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, পিতৃহীন মহর্ষি কপিল জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন, মহাত্মা শুকদেব ব্যাস তুল্য জনককে পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন, জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব অতুল ঐশ্বর্য্য, জগতের প্রভুত্ব, প্রাণপ্রিয়া পত্নী ও প্রিয়তম পুত্র প্রভৃতি পার্থিব প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, আজ শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও জগতের হিতার্থে সেই প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া সেইরূপ অনন্ত পথের পথিক হইলেন ।



তৃতীয় অধ্যায় ।

নিত্যানন্দ ও নবীন সন্ন্যাসী ।

“নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ ।

ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥”

নিত্যানন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন । সন্ন্যাসী আনন্দে বিভোর হইয়া উদ্ভাস্ত পথিকের ন্যায় চলিয়াছেন, নিতাই তাঁহার পাছে পাছে যাইতেছেন, কোথায় যাইবেন নিশ্চয়তা নাই ; বাটী হইতে বাহির হইয়াই প্রথমতঃ বক্রেশ্বর গমন করিলেন । একচক্রা গ্রাম হইতে বক্রেশ্বর অধিক দূরবর্তী নহে ; এই গ্রামে বক্রেশ্বর নামে একটি শিবের মন্দির আছে, তাঁহার নামানুসারেই উক্ত স্থানের নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে, তথায় কিছুদিন অতিবাহিত

করিয়া তথা হইতে বৈষ্ণনাথ গমন করিলেন এবং বৈষ্ণনাথ দর্শন করিয়া তথা হইতে গয়াধামে রওনা হইলেন । নিতাই প্রেমে বিভোর হইয়া কখনও ধীরভাবে, কখনও দ্রুতগতিতে চলিতেছেন ; কখনও রাস্তায় বসিতেছেন, কখনও হরি, হরি বলিয়া নাচিতেছেন, নিতাইর সেই ভুবন ভুলানমূর্তি, তরুণ-অরুণ-কান্তি, পদ্মপলাশলোচন, মৃদুমধুর গমন, সর্কীপেক্ষা সুন্দর প্রেমে ঢল ঢল বদন যে দেখিতেছে সেই ভুলিতেছে । যে একবার দেখিতেছে সেই বলিতেছে এ বালকটী কে ? এই তরুণ বয়সে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইয়াছে কেন ? ইহার কি পিতা মাতা নাই ? কেহ বলিতেছে এ বালকটী সামান্য নয়, ইহার অঙ্গের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও ভুবন ভুলানরূপ দেখিয়া ইহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ ইনি কোন অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন মানুষদেবতা হইবেন । এইরূপে সন্ন্যাসী নিতাইকে লইয়া গয়াধামে রওনা হইলেন । তথায় গয়াসুরের মস্তকে ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া নিতাই বলরাম ভাবে বিভোর হইলেন, নিতাইর নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল ; শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল, নিতাই একদৃষ্টে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন । অত্যাশ্রয় যাত্রী-গণ নিতাইর এই ভাব দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল, তাহারা সকলেই একদৃষ্টে নিতাইর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । এইরূপে গয়ার কার্য শেষ করিয়া কাশীতে গমন করিলেন । কাশীর অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া নিতাই আনন্দে অধীর হইলেন । এখানে গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়াছেন, ইহার দুইদিকে বরুণা ও অসি নামক দুইটী নদী আছে বলিয়া ইহার অশ্রু নাম বারাণসী । কাশী আনন্দকানন ; এখানে লোকের কোনরূপ কষ্ট নাই, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই আনন্দকাননের রাজা এবং অন্নপূর্ণা স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী । মাতা অন্নপূর্ণার প্রসাদে এখানে

কাহারও অন্ত চিন্তা নাই। তজ্জন্তই সাধুগণ বলিয়া থাকেন,—
 “যেষামন্ত গতিনাস্তি তেষাং গতি বারাণসী।” যাহাদের অন্ত গতি
 নাই, বারাণসীই তাহাদের একমাত্র গতি, ইহা অতি সত্য। সংসার-
 ক্লিষ্ট জীবগণ এখানে আসিয়া মুক্তিলাভ করেন, এ জন্ত ইহার অন্ত নাম
 মুক্তিক্ষেত্র। নিতাই এখানে আসিয়া প্রথমে মণিকর্ণিকায় স্নান করি-
 লেন, পরে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মূর্তি দর্শন করিলেন। ভগবান্ বিশ্বে-
 শ্বরের অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়া নিতাই প্রেমাভিষ্ট হইলেন, মুখে বাক্য
 নাই, শরীর নিষ্পন্দ, নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া বক্ষঃ-
 কপাট ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়া
 দর্শক মাতেই স্তম্ভিত হইল। এইরূপে কিছুকাল পরে নিতাই সংজ্ঞা-
 লাভ করিলেন। পরে তথা হইতে প্রয়াগে রওনা হইলেন। এখানে
 পতিতপাবনী-ত্রিতাপনাশিনী সগর বংশ-উদ্ধারকারিণী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা
 কলিকলুষনাশিনী গঙ্গা, প্রিয়সখী যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন।
 এ দৃশ্যটী বড়ই মনোহর, এখানে আসিলেই ভগবানের অপূর্ব লীলা
 দর্শন করিয়া স্বতঃই ভগবন্তক্তির উদয় হয়। একদিকে গঙ্গার প্রবল ধারা
 কলধৌত প্রবাহবৎ আসিতেছে, অতীত কালিন্দীর কাল প্রবাহ
 কল কলশব্দে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এ দৃশ্যটী
 বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। নিতাই এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে
 হৃৎকাকর করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, এবং সানন্দে জলক্রীড়া
 করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, তবু নিতাই উঠেন না
 দেখিয়া অবশেষে সন্ন্যাসী বলিলেন “নিতাই! এখন তীরে উঠ।”
 তৎপর তিনি ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন এবং মহানন্দে গঙ্গার পবিত্র
 জল করপুটে পান করিলেন। তৎপর তিনি দ্বাদশ বন দর্শন করিয়া
 গোকুলে প্রবেশ করিলেন। গোকুলে নন্দালয় দর্শন করিয়া যেই

তৃতীয় অধ্যায় ।

তাঁহার পূর্বকথা স্মরণ হইল আর অমনি অরুর হইয়া কাটিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে মদনগোপালকে নমস্কার করিয়া হস্তিনাপুর চলিলেন । এখানে পাণ্ডবগণ বাস করিতেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত পাণ্ডবগণের অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং বলরাম কীর্ত্তি দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট চিত্তে “ত্ৰাহি হলধর !” বলিয়া নমস্কার করিলেন । পরে তথা হইতে দ্বারকায় পৌঁছিলেন । দ্বারকায় যাইয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন । তারপর যথাক্রমে মহর্ষি কপিলের বাস স্থান সিদ্ধপুর, মৎস্য তীর্থ, শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী আদি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিলেন । কুরুক্ষেত্রে বিন্দু সরোবরে স্নান, প্রভাস তীর্থ দর্শন, ত্রিতকূপ, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন । কয়েক-দিন নৈমিষারণ্যে ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে অযোধ্যানগরে পৌঁছিলেন । তথায় ভগবান রামচন্দ্রের জন্মভূমি দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং ক্রমশঃ রামচন্দ্রের লীলা স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । পরে, গোমতী, গণ্ডকী ও শোন নদীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিলেন । তথায় পরশুরাম দর্শন করিয়া হরিদ্বার পৌঁছিলেন । এবং তারপর পম্পা ও বেণ্নাতীর্থ দর্শন করিয়া নিতাই শ্রীপর্বতে উপস্থিত হইলেন । তথায় এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করিতেন । তাঁহারা উহাদিগকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন । ইহারা পরম সাধু নিত্যানন্দকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের নিজ ইষ্টদেব বলিয়া চিনিতে পারিলেন । তখন ব্রাহ্মণী নিজ হস্তে পাক করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে যত্নপূর্বক খাওয়াইলেন এবং নিতাইকে ভিক্ষা দান করিলেন । নিতাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন । তৎপর তথা হইতে দ্রাবিড় পৌঁছিলেন,

তথায় বেঙ্কটনাথ দর্শন, কাবেরী নদীতে স্নান ও শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিয়া হরিশ্কেত্রে গমন করিলেন। তারপর তাঁহারা ঋষভ পর্বতে গমন করিয়া তাত্রপর্ণী দর্শনান্তর মলয় পর্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অগস্ত্য আশ্রয় দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এখানে কিছুদিন নির্জনে বাস করিয়া বৌদ্ধমঠ দর্শনে চলিলেন। তৎপর তথা হইতে কনকানগরে দুর্গাদেবী দর্শন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে স্নান করতঃ শ্রীঅনন্তপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পঞ্চ অম্বর সারোবরে স্নান ও গোকর্ণাখ্য শিব দর্শন করিয়া কুলাচলে পৌঁছিলেন। তথা হইতে রেখা, মাহেশ্বরীপুরী ও মল্লতীর্থ দর্শন করিয়া সূর্য্যারক গমন করিলেন এবং তথা হইতে পশ্চিমদিকে রওনা হইলেন।





চতুর্থ অধ্যায় ।



লক্ষ্মীপতি ও বিষ্ঠলনাথ ।

সংসারার্ণব ঘোরে যঃ কর্ণধার স্বরূপকঃ ।

নমোস্তু নিত্যানন্দায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

স্নাত্তে আছে দীক্ষিত না হইলে ধর্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার
জন্মে না, ইহা হিন্দুধর্মের চিরন্তন প্রথা। বিশ্ব প্রেমিক পরম ধার্মিক
সাধুগণ সকলেই এই নিয়মের অনুগামী হইয়াছেন ; সুতরাং পরম সাধু
নিত্যানন্দের জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘাটল না। তিনি শীঘ্রই
দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যিনি স্বয়ং ঐশী শক্তি সম্পন্ন
মহাপুরুষ তিনি অস্ত্রের নিকট দীক্ষিত হইবেন ইহা বাস্তবিকই
আশ্চর্যের বিষয় বটে ; কিন্তু লৌকিক শিক্ষার জন্ত তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ
আবশ্যক হইল। বলা বাহুল্য তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ সাধারণ মানবগণের
দীক্ষা গ্রহণ অপেক্ষা ভিন্ন রকমের হইল।

এই সময় শ্রীমাদ্বী সম্প্রদায় ভুক্ত পরম সাধু ভগবন্তুক্ত ব্যাস তীর্থের প্রধান শিষ্য শ্রীমল্লশ্রীপতি দাক্ষিণাত্যের তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন ; তথায় পণ্ডরপুর একটা মহাতীর্থ স্থান । এইস্থানে বিষ্ঠলনাথ (বিঠোবা) নামে একটা বিষ্ণুমূর্তি আছেন । পরম ভাগবত তুকারাম এই বিঠোবার ধ্যান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । লক্ষ্মীপতি ও বিঠোবার মূর্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহার শিষ্য গৃহে থাকিয়া অন-
জ্ঞাক্ষেপে চিত্তে বিঠোবার সেবা করিতে লাগিলেন ।

একদিন রজনীযোগে লক্ষ্মীপতি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন বিপুলবক্ষা, শালগ্রামস্তম্ভা মহাভূজ, প্রশস্ত হলধারী, শুভ্রকান্তি, পদ্মপলাশ-
লোচন কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন যে “অতি শীঘ্র এই নগরে একটা ব্রাহ্মণ কুমার আগমন করিবেন, তাঁহাকে তুমি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিও ।” এই কথা বলিয়া সেই অপূর্ণমূর্তি অদৃশ্য হইলেন । কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল । লক্ষ্মীপতি স্বপ্নবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । ভাবিলেন স্বপ্নে যাহা দেখিলাম ইহা কি সত্য ? আবার ভাবিতেছেন না ! ইহা আমার ভ্রান্তিমাত্র, এই-
রূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল । দিবাকর অরুণ রাগে পূর্বাঙ্গিক রঞ্জিত করিয়া উদিত হইলেন, অনতি প্রথমে প্রাতঃসূর্য্যের হৈম প্রভায় দিগ্ভঙ্গল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ স্তম্ভধরস্বরে বিভূ
শ্রবণ করিতে লাগিল, প্রকৃতি সুন্দরী নূতন সাজে সজ্জিতা হইলেন । লক্ষ্মীপতি মনে মনে রজনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে একটা ভূষার ধবলকান্তি ভুবনমোহনমূর্তি ধীর পাদবিক্ষেপে আগমন করিতেছেন, এই মূর্তি দেখিয়া লক্ষ্মীপতি চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন ইনি কে ? রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি ইনি কি সেই মহাপুরুষ ? না না এরূপ ভুবন ভুলান মূর্তি ত সাধারণ

মানুষে দেখা যায় না। ইহাকে স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়াই বোধ হইতেছে।

“প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে ।

হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেখানে ॥

নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী বিচারয় ।

কি অদ্ভুত তেজ মানুষে কভু নয় ॥”

(ভক্তি রত্নাকর ।)

সন্ন্যাসী আসিয়াই অবনত মস্তকে লক্ষ্মীপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “প্রভো, আমি বহু ভীর্থ ভ্রমণ করিয়া আপনার নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি, আপনি অমুগ্রহ পূর্বক এ অধমকে দীক্ষা মন্ত্র দান করিয়া উদ্ধার করুন” ।

“নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার ।

দীক্ষা মন্ত্র দিয়া কর আমায় উদ্ধার ।

(ভক্তি রত্নাকর ।)

লক্ষ্মীপতির স্বপ্ন সকল হইল দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন । আজ স্বয়ং ভগবান তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে ? লক্ষ্মীপতি দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শুভ মুহূর্ত্তে নিত্যানন্দকে মন্ত্র প্রদান করিলেন । নিত্যানন্দ দীক্ষিত হইয়াই তথা হইতে একাকী প্রস্থান করিলেন ।

এ স্থলে প্রশংসাবীণ নিত্যানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে । কারণ নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী

হওয়ার পরে পুনরায় সংসারাশ্রমী হইয়াছেন, ইহাতে শাস্ত্রবিধি অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহাই বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমালোচনা হইয়া থাকে, এবং অনেকে অকারণে তাঁহার নিম্নলিখিত চরিত্রে দোষারোপ এবং বিস্কন্ধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কটাক্ষপাতও করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এরূপ সংশয় হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। কর্ম জীবনে যাহারা ধর্মরাজ্যের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত তাহাদের পক্ষেই আশ্রম ধর্ম পালন জন্ত নিষেধ বা বিধির প্রয়োজন, কিন্তু ঐশী শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষে তৎসম্বন্ধে কোনও বিশেষ নিয়মের আবশ্যকতা নাই। কারণ ঐহারা নিষেধ বা বিধির অভীত, তাঁহাদের পক্ষে নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। এ সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মণ্যাচার্য কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বা ত্যক্তা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যাতে ন সপাপেন পদ্মপত্র মিবাশ্রুসা ॥”

(গীতা ।)

ঐহারা ভগবানে আশ্রম সমর্পণ করতঃ অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করেন, পদ্মপত্রস্থ জলের দ্বারা পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ।

নিত্যানন্দ স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতার, লীলা প্রকাশচ্ছলে তাঁহার বিবাহ করার একান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল, এই কারণে তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও পুনরায় গৃহধর্ম পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পবিত্র চরিত্রে দোষারোপ করা নিতান্তই পাষাণের কার্য ।

শ্রীভগবানের লীলা রহস্যের মৰ্মোদ্ঘাটন করা বড়ই দুৰূহ ব্যাপার ;
এই জন্তই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

“বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে ।

চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এ দিকে নবীন শিষ্য তথা হইতে পলাইয়া গিয়াছেন জানিতে
পারিয়া লক্ষ্মীপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । লক্ষ্মীপতি
অপূৰ্ব স্বপ্ন দেখিয়া নিত্যানন্দকে বলদেব বলিয়াই মনে করিয়া-
ছিলেন, এতদিন যাঁহাকে পাইবার জন্ত তিনি কঠোর তপস্যায়
ব্রতী হইয়াছিলেন, সৌভাগ্য ক্রমে সেই হারানিধি হৃদয় সৰ্ব্বথকে
পাইয়া পুনরায় হারাইলেন ইহাই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন,
আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বদা নির্জনে চিন্তা করিতে লাগি-
লেন । এইরূপে অধৈর্য্য হইয়া হঠাৎ তিনি শিষ্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া
অন্তর্হিত হইলেন ।

“প্রভু অদর্শনে দুঃখী হইলা লক্ষ্মীপতি,
দূরে গেল নিদ্রা, দেখে পোহাইল রাতি ।
কারে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য্য,
সেইদিন হৈতে দশা হইল আশ্চর্য্য ।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ,
অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন ।”

(ভক্তি রত্নাকর ।)

এ দিকে নিত্যানন্দ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া-
ছেন। চলিবার শক্তি নাই, কোনদিকে দৃকপাত নাই, নয়নে অনবরত
ধারা বহিতেছে, ক্লম্বাবেশে শরীর অবশ। কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন,
কখন বা ভাবে বিভোর, কখনও মুচ্ছা। এইভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের
জায় গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীহৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইলেন।
হৃন্দাবনে আসিয়াই নিতাইর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি শ্রীগোরা-
ঙ্গের জ্ঞান ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হৃন্দাবনের সর্বত্র খুঁজিতেছেন
কিন্তু নিমাইকে পাইতেছেন না। বনপথে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু
বিচরণ করিতেছে, কিন্তু নিতাইর সেদিকে লক্ষ্য নাই, প্রজ্ঞাচক্ষু
নিতাইর এ সংসারে ভীতিপ্রদ কিছুই নাই, স্বাপদগণ তাঁহাকে দেখিয়া
দূরে পলায়ন করিতে লাগিল, কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী
হইল না। নিতাই এইরূপে উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের জায় হৃন্দাবনে
বেড়াইতেছেন এমন সময় একদিন হঠাৎ বহু শিষ্য পরিবৃত্ত প্রশান্তমূর্ত্তি
ভগবন্ত একটা সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইনি সেই লক্ষ্মীপতির
প্রিয়তম শিষ্য বিশ্ব প্রেমিক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।

“মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর ;

প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ।

কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার ;

মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

মাধবেন্দ্রপুরী একজন মহাপুরুষ কৃষ্ণ ভক্ত। স্বয়ং মহাপ্রভুর মন্ত্র
ভক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ইহার শিষ্য। তাঁহাকে দেখিয়া মাজাই নিতাই
প্রেমে গদগদ হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিতাইর মুখে বাক্য

নাই, শরীর কল্পিত, নয়ন হইতে দর দর করিয়া অনর্গল অম্বরাগ অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, বদনমণ্ডলে অপূর্ব জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে, মাধবেন্দ্রপুরী একদৃষ্টে নিতাইরদিকে চাহিয়া আছেন, আর অবিরত প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। কিছুকাল পরে মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যা-নন্দকে ধরিলেন, তখন তাঁহার বাহুজ্ঞান হইল। তখন নিতাই মাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন “গোসাই! অচ্ছ আপনার চরণ দর্শন করিয়া ধন্ত হইলাম।” “এতদিন আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যাঁহাকে অন্বেষণ করিতে ছিলাম, অচ্ছ সেই সাধনার ধন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। প্রভু, আমি ভব-সাগরের ভীষণ আবর্তে পতিত হইয়াছি দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আর এই আশীর্বাদ করুন যেন শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।”

তখন মাধবেন্দ্রপুরী বলিলেন, “শ্রীপাদ আর এ দাসকে ছলনা করিবেন না।” নিতাই অধোবদন হইলেন। আজ ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন হইয়াছে, নিতাই বিশ্বপ্রেমিক, তিনি আজ পরম ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট প্রেমভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন, এ দৃষ্ট বড়ই অপূর্ব। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ জীবগণকে এই ভাবেই প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

“কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব স্বভাব।

গুরুসম লঘুরে করয়ে দাস্তভাব ॥”

(চৈতন্য চরিতামৃত।)

ভক্তের নিকট ভগবান্ অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু আর জগতে কিছুই নাই। পতিপ্রাণা সতী যেরূপ প্রিয়তম পতির দর্শনে নিঃশল সুখ লাভ করেন, ভক্তও ভগবানের দর্শনে সেইরূপ সুখ অনুভব করেন। ভগবানের দর্শন, স্পর্শ ও চিন্তায় যে সুখ পার্থিব কোন বস্তুই সে

সুখ দিতে পারে না। যুহুর্ন্ত অদর্শনে প্রেমিকের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং দর্শন করিলে হৃদয় অপূর্ব আনন্দরসে আপ্ত হয়। কত-ক্ষেণে সেই হৃদয় সর্বস্বকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, প্রেমিকের হৃদয় কেবল এই চিন্তাতেই পূর্ণ থাকে। অমুরাগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রেমিক অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, আত্ম সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে না।

আজ মাধবেন্দ্রপুরীও সেই নবামুরাগ জনিত সুখে বিভোর হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। নিতাই ও মাধবেন্দ্রপুরী উভয়েই প্রেমের উৎস; কাজেই পরস্পর সন্দর্শনে উভয়েরই হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ বিহ্বলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। ভক্ত ভগবানকে দূরে রাখিয়া সুখী হন না, তিনি সেই অনন্ত প্রেমের আকর স্বরূপ শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, মাধবেন্দ্রপুরী বহুদিন হইতে ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আশা করিয়াছিলেন, আজ তাহা সম্পূর্ণ হইল। নিতাই ও মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমে বিহ্বল হইয়া পরস্পর পরস্পকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া ঈশ্বরপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বাহুজ্ঞান লাভ করিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান অনেকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পুনরায় উভয়ে মুচ্ছিত হইলেন। দুইজনের নয়ন হইতে অবিরত দ্রবময়ী প্রেমধারা নির্গত হইয়া ধরণীতল সিক্ত করিতে লাগিল। নিতাই ক্রম প্রেমাবেশে ঘন ঘন হকার করিতে লাগিলেন এবং দুই প্রভু গড়াগড়ি বাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীরে কখনও হস্ত, কখনও ক্রন্দন, কখনও কম্প, কখনও মুচ্ছা এইরূপ নানাভাবেয় বিকাশ পাইতে লাগিল।

“প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে ।

পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥

কম্প, তশ্র, পুলক, ভাবের অন্ত নাঞি ।

দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

কিছুকাল পরে দুই প্রভু প্রকৃতিস্থ হইলেন । মাধবেন্দ্রপুরী
নিতাইকে উঠাইয়া কোলে লইলেন, এবং বলিলেন “যে এতদিনে
জানিলাম আমার প্রতি ভগবানের দয়া আছে, আমার জন্ম সার্থক
হইল ।” মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যগণও সকলেই নিতাইর প্রতি ভক্তিমান
হইলেন ।





পঞ্চম অধ্যায় ।



তীর্থযাত্রা ।

“বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তৎপ্রিয়ং শ্রীগদাধরম্ ।

নিত্যানন্দঞ্চ তদভূত্বা তথাচাবৈত সংজ্ঞকম্ ॥”

নিতাই মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুর জায় ভক্তি করিতে লাগিলেন, মাধবেন্দ্রপুরীও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী জানিতেন যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভগবানের অবতার, আমি তাঁহার অনুরূপেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইব; এতজ্ঞ তিনি বাহ্যিক স্নেহ দেখাইলেও মনে মনে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

“নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে অবগে ।

অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বेष রহে ।

ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এইরূপে কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া ত্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নিতাইকে লইয়া তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন । বৃন্দাবন হইতে বরাবর সেতুবন্ধে পৌঁছিলেন, তথায় ধনুতীর্থে স্নান করিয়া রামেশ্বর গমন করিলেন । তৎপর মায়াপুরী, অবন্তী, বিজয়ানগর প্রভৃতি দর্শন করিয়া গোদাবরী প্রদেশে উপস্থিত হইলেন । তথায় নৃসিংহদেবপুরী, ত্রিমল্ল ও কূর্মনাথ দর্শন করিয়া নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন । পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমূর্তি দর্শন করিবামাত্র নিতাই প্রেমের আকুল উচ্চাসে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার শরীরে কম্প, পুলকান্দ্র, স্বেদশ্রুতি প্রভৃতি সাত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল । প্রেমাবিষ্ট নিতাই ক্লম্ব প্রেমা-বেশে ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ।

“কম্প, স্বেদ, পুলকান্দ্র, আছাড়, হুঙ্কার ।

কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন । পুরীধামে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তথা হইতে গঙ্গাসাগরে গমন করিলেন । এখানে ভাগীরথী শতযুগে সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, কোতুকী নিতাই এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং প্রেমে পুলকান্দ্র হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন । মনের উল্লাসে কিছুকাল জলক্রীড়া করিয়া পুনরায় তীরে উঠিলেন । তারপর তথা হইতে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন । এখানে আসিয়া নিতাইর ভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিল, তিনি ক্লম্বপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন । দিব্যাত্ম জ্ঞান নাই, আহার নিদ্রা বোধ নাই, যদি কেহ আগ্রহ করিয়া কিছু খাইতে

দিত তাহা হইলে খাইতেন, নতুবা অনাহারেই থাকিতেন। এই অবস্থায় মহাপ্রভুর সহিত মিলনের জন্ত তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রজ্ঞা চক্ষু নিত্যানন্দ সর্বদর্শী; তাঁহার দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত, তাঁহার অজ্ঞেয় কিছুই নাই। এদিকে শ্রীগৌরান্ধ নবদ্বীপে গুপ্তভাবে লীলা করিতেছেন, তাহা তিনি সমুদয়ই জ্ঞাত আছেন, যদিও শ্রীমন্নিত্যানন্দ সর্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু শ্রীনিমাই দ্বারা যুগধর্ম প্রচার করিবেন এবং নিজে তাঁহার সঙ্গী হইবেন এইজন্ত নিতাই স্বয়ং বিষ্ণুভক্তি প্রচার কিস্থা শক্তিসঞ্চার করিলেন না; যখন মহাপ্রভুর অবতার আরম্ভ হইবে, সেই সময় যাইয়া তিনি শ্রীনিমাইর সহিত মিলিত হইবেন ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা এবং এই জন্তই তিনি এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে ছিলেন।

“নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে ।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥
আপন ঐশ্বর্য প্রভু প্রকাশিবে যবে ।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায় ।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥”

এইরূপে কিছুদিন অভিবাহিত হইলে পর, একদা নিতাই কৃষ্ণা-বেশে বিভোর হইয়া স্বপ্নঘোরে দেখিলেন যেন “ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীব উদ্ধারের জন্ত মহাপ্রভুরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া লীলা করিতেছেন। তাঁহার করে সে মোহন যুরলী নাই, কটাতে সে পীতধড়া নাই, শিরে মোহন চূড়া নাই, তিনি এখন নবদ্বীপে নবীন সন্ন্যাসী হইয়া জীবগণকে জগৎবৎ প্রেম বিস্তরণ করার সাহায্যার্থে যেন তাঁহাকে আস্থান করিতেছেন।” এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিতাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।



বঠ অধ্যায় ।

—:~:~:~:—

নবদ্বীপের পথে ।

“নানাবর্ণ বস্ত্রে পাগ, রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে,
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল ।

হাসিয়া চলিছে পথে, পায়েতে মুপূর বাজে,
কেগা তুমি যেন মাতোয়াল ?

আমারে চেন না ভাই, বাড়ী এবে নদীয়ায়,
সদা নাচি তাহে মুপূর পায় ।

শুনেছ নদে অবতার, শ্রীগোবিন্দ নাম যাঁর,
আমি নিতাই তার বড় ভাই ।”

নিত্যানন্দের উৎকর্ষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আর ভিত্তিতে পারিলেন না, অবশেষে নবদ্বীপ গমনে উদ্বৃত্ত হইলেন। নদী যেমন

দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দও সেইরূপ প্রাণের ব্যাকুলতায়, মনের অদম্য ইচ্ছায়, বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবল উত্তেজনায় শ্রীগোরাঙ্গের সহিত মিলনাশায় “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজ নিত্যানন্দের প্রেমসিঙ্গুর প্রবল প্রবাহ বেলা-ভূমি অতিক্রম করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে প্রাবিত করিতে ধাবিত হইয়াছে, কাহার সাধ্য সে গতি রোধ করে? প্রেমবিহ্বল নিতাইর বাহুজ্ঞান রহিত, নয়নে জলধারা, মুখে হরেকৃষ্ণ ধ্বনি। কখনও চলিতেছেন, কখনও উপবেশন করিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাদিতেছেন, কখনও উর্দ্ধদৃষ্টি, কখনও মুচ্ছাগত, এইভাবে মদমত্ত করীর স্থায় চলিয়াছেন। পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই দ্বিজ্ঞাসা করিতেছেন ভাই, নবদ্বীপ কতদূর? নিতাইকে যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে এ কি মাতাল?

জ্যৈষ্ঠমাস, গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ, এই সময় নিতাই নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। নিতাই পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, প্রথমে রৌদ্রের তাপে শোণার অঙ্গ মলিন হইয়াছে, শরীর হইতে অনবরত শ্বেদশ্রুতি হইতেছে। এই অবস্থায় নিতাই নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বলরামভাবে বিভোর হইলেন। বহুকাল পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আজ তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি কখনও দ্রুত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও ধূলয় গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনও মুচ্ছিত হইতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, তাঁহার শরীরে ভক্তি প্রকাশক ভাবগুলি উদ্দীপিত হইতেছে, নিতাই এইরূপে উন্মত্তবৎ বেড়াইতেছেন আর সকলকেই বলিতেছেন “ভাই, নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোথায় তোরা আমাকে বলিয়া দে।”

নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী, তোরা বল্ । ধূয়া,
 ক্ষণযুগ পদ করি (নিতাই) লাফে লাফে যায় ।
 এক কয় আর বলে, (কথা) বুঝনে না যায় ।
 উদ্ধবাহু হ'য়ে নিতাই প্রেমভরে ধায় ।

(চৈতন্যমঙ্গল ।)

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে নিতাই শ্রীনন্দন আচার্য্যের আলয়ে
 উপস্থিত হইলেন । নন্দন আচার্য্য একজন পরম সাধু, বৈষ্ণবভক্ত ও
 অতিথি পরায়ণ । তিনি নিতাইর সন্ন্যাসবেশ, প্রকাণ্ড শরীর, আজ্ঞাসু-
 লম্বিত বাহু, সম্মিত আনন, বিশ্বতুল্য অধর, যুক্তাসদৃশ দশন, পদ্ম-
 পলাশ লোচন এবং সর্কাপেক্ষা সুন্দর তাঁহার অমুরাগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া
 যুগপৎ ভয় ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন । পরম যত্নে তাঁহার
 অভ্যর্থনা করিলেন ।

“জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে ।

আসিয়া রহিল নন্দন আচার্য্যের ঘরে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এদিকে শ্রীনিমাই নিতাইর আগমনবার্তা জানিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া-
 ছেন । বলা বাহুল্য শ্রীমদ্বিত্যানন্দের আগমনের তিন চারি দিন পূর্বেই
 শ্রীনিমাই তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন যে “অতি সত্বরই এই
 নবদ্বীপধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে ।”

“(আরে) ভাই সব, দুই তিনদিনের ভিতরে ।

কোন মহাপুরুষ এক আসিবে এথারে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

যেদিন নিতাই নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন সেই দিন প্রাতঃকালে শ্রীনিমাই বিষ্ণুপূজা করিয়া যেখানে বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়াছেন তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন “আজ রাত্রিতে আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি।” যেন কোন মহাপুরুষ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অবধূত বেশ, পরিধেয় নীলবস্ত্র, মস্তকে নীলবস্ত্রের পাগড়ী কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, স্কন্ধে একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ, প্রকাণ্ড শরীর, আজ্ঞাশূলম্বিত বাহু, শরীরে ব্রহ্মতেজঃ। তাঁহাকে শ্রীবলরাম বলিয়া বোধ হইল। আমার নিকট আসিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম প্রভু, আপনি কে? তিনি বলিলেন “আগামী কল্য আমার পরিচয় পাইবে। তোমাতে আমাতে অভিন্নভাব জানিবা।”

“হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।

আপনারে বাসৌ মুঞি, যেন সেই সম ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই কথা বলিতে বলিতে নিমাই বলরাম ভাবে আবিষ্ট হইলেন। তখন হুকুর করিয়া “মদ আনো”, “মদ আনো”, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এবং পুনঃ পুনঃ মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন।

“মদ আনো”, “মদ আনো” বলি প্রভু ডাকে।

হুকুর শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিমাইর “মদ আনো”, “মদ আনো” শব্দ শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত

বলিলেন “প্রভু, তুমি যে মদিরা চাহিতেছ, সে মদতো তোমার কাছে ; আমরা তাহা কোথায় পাইব ?” অন্যান্য ভক্তগণ নিমাইর এই অবস্থা দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন । কিছুক্ষণ পরে নিমাই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । তখন তিনি বলিলেন “আমার মনে হয় এই নগরে কোন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, যাও তোমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়া আইস । তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস দুইজনেন তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন । নবদ্বীপের চতুর্দিকে বেড়াইলেন কিন্তু মহাপুরুষের খোঁজ করিতে পারিলেন না । অবশেষে অপরারে তাঁহারা আসিয়া বলিলেন যে “আমরা নবদ্বীপের চতুর্দিকে খুঁজিয়া বেড়াইলাম, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি বৈষ্ণব, কি পাষণ্ড সকলের গৃহই দেখিলাম কিন্তু কোথাও মহাপুরুষের অনুসন্ধান পাইলাম না ।” এই কথা শুনিয়া নিমাই হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন “চল আমরা সকলে মিলিত হইয়া মহাপুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসি ।” ভগবানের লীলা বুঝা, মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, অতএব তাঁহার ভক্তগণই লীলামূর্তের এই মধুর আশ্বাদ বুঝিতে পারেন । কৌতুকী নিতাই এই কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন যে নিত্যানন্দ বড়ই গোপনীয়, সাধন বলে তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে ।

“বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে ।

চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিমাইর আজ্ঞা পাইয়া ভক্তবৃন্দ মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ধ্বনি করিয়া মহানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন । নিমাই কতকদূর

অগ্রসর হইয়া পুনরায় মুরারীকে ডাকিয়া বলিলেন “মুরারি, তুমি অবধূত দেখিবে না? শ্রীনন্দন আচার্য্যের আশ্রয়ে তিনি আছেন, আমরা তথায় যাইতেছি, তুমি শীঘ্র আইস।”

ভগবান্ ভক্তের অধীন। মুরারি নিমাইর পরম ভক্ত; কাজেই তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না, মুরারীও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। ভক্তগণ নিমাইকে মধ্যে রাখিয়া মহোল্লাসে গমন করিলেন। নিমাই প্রেমে বিভোর, নয়নে প্রেমাশ্রু, শরীরে পুলক, মুখে হরিনামের ধ্বনি।

“পথে যাইতে ঘন ঘন “হরিহরি বোল”।

শ্রীঅঙ্গে পুলক কণ্ঠে গদগদ রোল ॥

নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা।

চলিতে না পারে পথে সোণার কিশোরা ॥”

এই ভাবে যাইতে যাইতে নিমাই পার্শ্বদগণসহ নন্দন আচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া দেখেন যে নন্দন আচার্য্যের ঘরে কোটী সূর্য্যের প্রভাসম্পন্ন নীলবর্ণ বস্ত্র পরিহিত একটা সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার বিশাল বগুঃ, আজ্ঞামূলব্ধিত বাহু, সম্মিত বদন ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি। মুখচন্দ্র হইতে যেন সহিসুতার কৌমল দীপ্তি অনবরত বাহির হইতেছে। ইনিই শ্রীমন্নিত্যানন্দ! বয়স অল্পমাত্র ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর হইবে।

নিত্যানন্দকে দেখিবামাত্র বিশ্বম্ভর গণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সন্মুখে দাঁড়াইলেন। বিশ্বম্ভরের নাগর বেশ, একে ভুবন ভুলান রূপ, তাহাতে মনোহর সাজে সজ্জিত হওয়াতে আরও অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে।

“বিশ্বস্তর মূর্তি যেন মদন সমান ।
 দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥
 কি হয় কণকদ্যুতি সে দেহের আগে ।
 সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে ॥
 দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন ।
 আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥
 সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন ।
 তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিভ্যানন্দ নিমাইয়ের বদন মণ্ডল দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। উৎসুকোপোষিত নয়নে পুনঃ পুনঃ নিমাইর মুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। বহুদিনের পর দুই ভাইয়ের মিলন হইয়াছে, কাজেই দুইজনেই প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের দর্শন পিপাসা মিটিতেছে না, প্রাণের আবেগ দূর হইতেছে না, হৃদয়ের ব্যাকুলতা ধামিতেছে না। যেন এক নূতন দৃশ্য উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ নিতাইর পদ্যপলাশ লোচন প্রেমাশ্রুতে পরিপ্লুত হইল। এই-রূপে কণকাল পরস্পরে চাওয়া চাহির পর নিতাইর উদ্বোধনের নিমিত্ত নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক একটি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন।

শ্রীবাস শ্লোক পাঠ করিলেন।

“বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কৰ্ণয়োঃ কৰ্ণিকারম্,
 বিভ্রম্বাসঃ কনককপিশম্ বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্ ।

রক্ষান্ বেগোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দে-
বৃন্দারণ্যম্ স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ্ গীত কীর্তিঃ ॥”

(শ্রীমত্তাগবত, ১০ম স্কন্ধ ।)

নটবর শ্রীনন্দনন্দন অধরসুধা দ্বারা বেগুরক্ষ পূর্ণকরতঃ শ্রীবৃন্দারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তাঁহার শিরোদেশে ময়ূর পুচ্ছ নির্মিত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুমুম, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইয়াছিল । গোপীগণ তাঁহার কীর্তি গান করিতে লাগিল, বৃন্দাবন তদীয় পদচিহ্নে চিত্তিত হইয়া পরম রতিজনক হইয়া উঠিল ।

এই শ্লোক শুনিবামাত্র নিতাইর হৃদয়ে প্রেমের বেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । সে বেগ কিছুতেই থামে না, ভক্তগণ বহু চেষ্টা করিয়াও থামাইতে পারিলেন না, নিতাই প্রেমে বিহ্বল হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন । তাঁহার শরীরে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেম-চিহ্ন প্রকাশ পাইল । নিমাই শ্রীবাসকে বলিলেন, “পড়” “পড়” । ইহা শুনিয়া শ্রীবাস পুনরায় শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । নিতাই ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া ধরণী সিক্ত হইল । নিতাই আনন্দে বিভোর হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, এবং কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও বৃচ্ছা, কখনও হৃৎকারধ্বনি করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ তাঁহার প্রেমের অমাত্মিক উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রেমোন্মত্ত নিতাই এক একবার ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, “আমার কানাইয়া গোয়াল কোথায় গেল ?”

“পড়িয়া গড়িয়া উঠে বোলয়ে সামাল ।
সবাকৈ বোলয়ে কাঁহা কানাঞা গোয়াল ॥”

(চৈতন্ত ভাগবত ।

নিমাই নিতাইর এই উদ্যম নৃত্য দেখিয়া তাঁহাকে ভূমিতে পড়িয়া
প্রণাম করিলেন এবং সসম্মানে বলিলেন, “প্রভু, আজ আমার জীবন
সার্থক হইল, বহুভাগ্যে আজ আপনার চরণ দর্শন করিলাম ।” তখন
নিতাই প্রেমভরে কহিলেন ;—

“সকল জগৎ চাহি ফিরিয়া আইনু ।
কোথাও তোমার লাগ, মুই না পাইনু ॥
শুনিলাম গোড়দেশে নবদ্বীপপুরে ।
লুকাঞা রয়েছে আসি নন্দের কুমারে ॥
চোর ধরিবারে আজ আইলাম হেথা ।
ধরিলাম চোর আজ পলাইবে কোথা ॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে ।
গৌরাজ্ঞ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ কাছে ॥”

(চৈতন্ত ভাগবত ।)

ক্লগকাল পরে নিতাই মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । তখন
নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে লইলেন । নিমাইর কোমল কর
স্পর্শমাত্র নিতাই নিষ্পন্দ হইলেন এবং ছুই ভাই যোদন করিতে
লাগিলেন । কিছুকাল পরে শান্ত হইয়া নিমাই বলিতে লাগিলেন,
“প্রভু, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, তোমার শ্রীচরণ দর্শন

করিয়া এ দাস ধন্ত হইল । তুমি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তোমাকে যে ভজনা করে সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে । তুমি ভগবানের পূর্ণ অবতার, পাপীজন্যের উদ্ধারকর্তা এবং ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ধর্গ ফলদাতা ।”

“মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ ।

তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিমাইর স্তুতি শুনিয়া নিতাই লজ্জিত হইলেন, এবং সহাস্র বদনে বলিতে লাগিলেন যে, “আমি বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখি নাই । পরে জানিতে পারিলাম যে তুমি লীলা প্রদর্শন জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাই তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমি এখানে আসিলাম ।”

তার পরে দুইজনে “ঠারে ঠারে” আরও কত কথা বলিলেন, কিন্তু অল্প কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না । নিতাই প্রথমতঃ নিমাইকে দেখিয়া ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই, কারণ ব্রজরাজের ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কাল, কিন্তু নিমাইর বর্ণ কাঁচা সোণার তায় উজ্জ্বল । মস্তকে শিখি-পুচ্ছ নাই, অধরে মুরলী নাই, কটীতে পীত ধড়া নাই, ব্রজের সে মোহনবেশ কিছুই নাই, এ যেন সম্পূর্ণ নূতন সাজ ! শুধু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি পদ্ম-পলাশ লোচন দুইটী অমুরাগে ঢলঢল করিতেছে, ইহাই দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই সেই বৃন্দাবন বিহারী গোপী-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণ ! তখন নিতাই প্রেমাবিষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—নিতাই একটু তোতলা ছিলেন—

“কা—কা—কানায়ে নাকি তুইয়ে ।

কই তোর চুড়া-বাঁশরী ।

তাহাতে নিমাই উত্তর করিলেন :—

কি পুছলি ভাই আমার ।
 ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি ।
 এবার নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি ॥
 ব্রজের খেলা বাঁশীর তান ।
 নদের খেলা হরি গান ॥
 ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া ।
 নদের বেশ কোঁপীন পরা ॥”

এইরূপে দুই ভাইয়ে অনেক কথা হইল । প্রেমে বিহ্বল হইয়া অনেকক্ষণ প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিলেন । তারপর নিমাই বলিলেন, “শ্রীপাদ, আমার পরম সৌভাগ্য যে অল্প আপনার অনুগ্রহ লাভ করিলাম । এখন গাত্ৰোত্থান করুন ।” নিতাই গাত্ৰোত্থান করিলেন এবং এই হইতে নিমাইর সঙ্গী হইলেন ।

“দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ ।”





সপ্তম অধ্যায় ।



ব্যাস পূজার উদ্যোগ ।

“যৎকরোসি যদগ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্বসি কৌন্তেয়, তৎকুরুষ্ব মদপৰ্গম্॥”

(গীতা ।)

এই ভাবে দুই ভাইয়ের নানা প্রসঙ্গে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন, “শ্রীপাদ, আগামী কল্য পূর্ণিমা তিথিতে ব্যাস পূজা হইবে; আপনি কোথায় ব্যাস পূজা করিবেন?” নিমাইর ইঙ্গিত ক্রমে কৌতুক প্রিয় নিতাই শ্রীবাস পণ্ডিতের হাত ধরিয়া বলিলেন, “আমার ব্যাস পূজা এই বামনার ঘরে হইবে।”

“নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত ।

হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥

হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বস্তর ।

ব্যাস পূজা এই মোর বামনার ঘর ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন নিমাই হাসিয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, “পণ্ডিত, তোমার ষাড়ে বড় গুরুতর বোঝা পড়িল ।” শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভু, তোমার রূপায় আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, বস্ত্র, চক্ষু, ঘৃত, পান, সুপারী প্রভৃতি পূজোপকরণ সমুদয় দ্রব্যই আমার গৃহে মজুত আছে । শুধু পূজার পুঁথিখানা নাই, তাহা আমি আনিয়া দিব ।”

ইহা শুনিয়া নিতাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । তখন নিমাই নিতাইকে বলিলেন, “শ্রীপাদ, চলুন আমরা সকলে পণ্ডিতের বাড়ী যাই,” এই বলিয়া সকলে উঠেঃস্বরে হরিনামের ধ্বনি করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন । শ্রীবাসের আগ্নিনায় গমন করিবামাত্র দ্বারের কপাট বন্ধ হইল । তখন নিমাই সংকীৰ্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন । ভক্তগণ আজ্ঞা পাইয়া মহোল্লাসে সংকীৰ্ত্তনে মত্ত হইলেন । সংকীৰ্ত্তনেব্র নিত্যানন্দ আজ কীৰ্ত্তনে যোগদান করিলেন । গৌর নিতাই দুই ভাইকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সকল ভক্তগণ কীৰ্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন । গৌর নিতাই প্রেমে বিহ্বল হইয়া উদ্গত নৃত্য আরম্ভ করিলেন । নৃত্য করিতে করিতে দুই ভাইয়ে কোলাকুলী করিলেন, তখন বিশ্বস্তরের বলরাম ভাব হইল । তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বিমুগ্ধটায় যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং “মদ আনো,” “মদ আনো” বলিয়া নিত্যানন্দকে আদেশ করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরান্দের শরীরে কম্প, নয়নে জলধারা, মুখে কৃষ্ণনাম । নিতাই বলরাম ভাবে আবিষ্ট হইয়া “শীঘ্র আমাকে হল, যুষল প্রদান কর বলিয়া পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ।” তখন ভক্তগণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত এক ঘটা গঙ্গাজল আনিয়া শ্রীগৌরান্দের প্রদান করিলেন এবং

অত্যাগত ভক্তগণকে দিলেন । তখন শ্রীগোরাঙ্গ * ‘নাড়া’, ‘নাড়া’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ।

“সঘনে ঢুলায় শির “নাড়া নাড়া” বলে ।

নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে ॥”

‘নাড়া’ কে তাহা কেহই অবগত নহেন, কাজেই প্রভুর কথা কেহই বুঝিতে পারিলেন না । শেষে শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভু, নাড়া কে ?” কিছুক্ষণ পরে নিমাই বলিলেন, এতক্ষণ “নাড়া নাড়া” বলিয়া যাহার কথা বলিয়াছি, তিনি অদ্বৈত আচার্য্য । আমি তাহাকে বড় ভালবাসি তাহার জন্তই আমার এই অবতার । নাড়া বৈকুণ্ঠ হইতে আমাকে আনিয়া এখন হরিদাসকে লইয়া সে কোথায় গেল ? আমি এবার ঘরে ঘরে সংকীৰ্ত্তন প্রচার করিয়া আপামর সাধারণ সকল জীবগণকেই ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিব ।” এই কথা বলিবার পরে নিমাই বাহুজ্ঞান পাইয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, “পণ্ডিত, আমি কি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি ?” শ্রীবাস বলিলেন, “কিছুই না ।”

অতঃপর নিমাই সকলকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন, “আমি অনেক সময় তোমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তোমরা তাহা বালক স্নুলভ চপলতা মনে করিয়া ক্ষমা করিবে ।” এদিকে নিতাইর উদ্যম নৃত্য কিছুতেই থামিতেছে না, দীর্ঘকালের পর নিমাইর ভগবদ্ভাব দর্শনে নিতাই আরও ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেমচিহ্ন প্রকাশ পাইল । বহুক্ষণ পরে নিতাই স্থির হইলেন । নিতাইকে শ্রীবাসের মন্দিরে রাখিয়া নিমাই চলিয়া গেলেন । রজনীতে পুনরায়

* শ্রীগোরাঙ্গ অদ্বৈত প্রভুকে ‘নাড়া’ বলিয়া ডাকিতেন ।

নিতাইর বলরাম ভাব প্রকাশ পাইল, তিনি হুঙ্কার করিয়া আপনার দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ভগবানের লীলা বোঝা ভার। তিনি লোক শিক্ষার নিমিত্তই সকল কাজ করিয়া থাকেন। এতদিন সন্ন্যাসী হইয়া নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, আজ নবদ্বীপে আসিয়া সেই মহাশক্তির সহিত তাঁহার মিলন হইল। এখানে ভক্তিয়োগ প্রচার করিবেন আর দণ্ড কমণ্ডলুর আবশ্যকতা কি? এইজন্ত তিনি দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতিবাহিত হইল, প্রাতঃকালে নিতাই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রামাই পণ্ডিত আসিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু পড়িয়া আছে, নিতাই অচেতন। রামাই পণ্ডিত এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট সমুদয় বিবরণ বলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত নিমাইকে সংবাদ দিলেন। রামাই পণ্ডিতের নিকট দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গার সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিমাই দ্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন নিতাই অজ্ঞানাবস্থায় স্নমধুর হাস্য করিতেছেন, শরীর হইতে অপূর্ণ জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তখন নিমাই নিতাইর দণ্ড কমণ্ডলু স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করিয়া নিতাইকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গান্নানে গমন করিলেন এবং দণ্ড কমণ্ডলু আদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। নিতাই গঙ্গা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। গঙ্গার মধ্যে বড় বড় কুম্ভীর বিচরণ করিতেছে, নিতাই নির্ভীকচিত্তে সম্ভরণ করিতেছেন আর ঐ সকল কুম্ভীর, ধরিতে যাইতেছেন, কাহারও নিষেধ মানিতেছেন না। অনেকে বারণ করিল, তাহা শুনিলেন না। একমাত্র নিমাই ব্যতীত আর কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করেন না, অবশেষে নিমাই বলিলেন, “শ্রীপাদ, এখন উঠ, ব্যাস পূজার সময় হইয়াছে।” ইহা শুনিয়া নিতাই তীরে উঠিলেন

এবং সকলে একত্র হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যাস পূজা আরম্ভ হইল। স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজার আচার্য্য। তাঁহার আজ পরমানন্দ। যে ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা অভিলাষ করেন, আজ সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং তাঁহার ঘরে ব্যাস পূজা করিতেছেন, এবং তিনিই তাঁহার আচার্য্য, ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? ভগবান্ ভক্তের অধীন; শ্রীবাস প্রভুর পরম ভক্ত, কাজেই ভগবান্ আজ তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

ব্যাস পূজা আরম্ভ হইল। ভক্তগণ চতুর্দিকে মধুর সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পূজা শেষ করিয়া সুগন্ধ ফুলের মালা লইয়া নিত্যানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, “শ্রীপাদ, এই মালা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ব্যাসদেবকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর।” নিতাই মালা গ্রহণ করিলেন না। শ্রীবাস বলিলেন, “শাস্ত্রে আছে, স্বহস্তে মালা পরাইতে হয়; তাহা হইলে ব্যাসদেব তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। অতএব তুমি স্বহস্তে মালা প্রদান কর।” নিতাই অশ্রমনস্ক হইয়া মালা ধরিলেন, তখন শ্রীবাস বলিলেন, বল “ব্যাসায় নমঃ,” নিতাই বলিলেন, “হাঁ।” এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলাতেও নিতাই শুনিলেন না, তিনি মালা হাতে করিয়া এ দিক ও দিক চাহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীবাস অনন্যোপায় হইয়া নিমাইকে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু, শ্রীপাদ তো ব্যাস পূজা করিতেছেন না, আপনি একবার এ দিকে আসুন।”

“প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।

না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥”

(চৈতন্য ভাগবত।)

শ্রীনিমাই অশ্রুদিকে কীর্তনানন্দে বিভোর ছিলেন। শ্রীবাসের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া নিতাইকে বলিলেন, “শ্রীপাদ, মালা দিয়া শীঘ্র ব্যাস পূজা করুন।” নিতাই বহুক্ষণ যাহাকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ব্যাস পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন, এতক্ষণে সেই পূর্ণব্রজ সনাতন স্বরূপ শ্রীগৌরান্ধদেবকে সম্মুখে পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া মধুর কীর্তন করিতে লাগিল। অতঃপর শ্রীনিমাই শ্রীবাসকে বলিলেন, “পণ্ডিত, ব্যাসপূজার নৈবেদ্যাদি শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।” তাঁহার আজ্ঞাক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিত সমুদয় লইয়া আসিলেন। তৎপর শ্রীগৌরান্ধ স্বয়ং ঐ সমুদয় নৈবেদ্যাদি নিজ হস্তে সকলকে বিভরণ করিলেন। গৌরান্ধদেবের শ্রীহস্তের দ্রব্য পাইয়া বৈষ্ণবগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কীর্তন আরম্ভ করিলেন।





অষ্টম অধ্যায় ।

নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ দর্শন ।

“অদৃষ্ট পূর্ব্বং হ্রষিতোন্মি দৃষ্টা,

ভয়েন চ প্রব্যথিং মনো মে ।

তদেব দর্শয় দেবরূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥”

(গীতা ।)

ঐশ্বর্য জগতে ভগবানের লীলা রহস্ত বড়ই প্রাণস্পর্শী । তিনি ইচ্ছানুসারে সময় সময় বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন ।

একদিন নিতাই ভিক্ষাচ্ছলে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন । শ্রীবাস পণ্ডিত পরম সমাদর করিয়া নিত্যানন্দকে ভিক্ষা

প্রদান করিলেন। এমন সময় নিমাই শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদন প্রফুল্ল, নয়নে প্রতিভার বিমল জ্যোতিঃ, শরীরে দৈবতেজঃ। আসিয়াই বিদ্যাধেগে দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুর আসনে উপবেশন করিলেন। তারপর নিতাইকে বলিলেন, “শ্রীপাদ, তুমি এতদিন আমার জ্ঞান পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, এখন নয়ন ভরিয়া আমাকে দেখ”। এই কথা শুনিয়া নিতাই নিমাইর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং পরস্পর চাওয়া চাহি করিয়া যেন কি বলিলেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারিল না। কিছুকাল পরে নিমাই গৃহস্থিত অত্যাশ্রয় বৈষ্ণবগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সকলে মন্দিরের বাহিরে গেলেন; সুধু নিতাই ঘরে রহিলেন। নিমাই অমনি বড়ভুজমূর্তি ধারণ করিলেন।

অর্জুন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যেক্রূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, নিত্যানন্দও সেই প্রকার শ্রীগৌরাস্বরের বড়ভুজমূর্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নিতাই একদৃষ্টে নিমাইর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, নিমাইর বড়ভুজমূর্তি দর্শন করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, অমনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

নিমাই ভগবদ্ভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘন ঘন হৃদয় করিতে লাগিলেন। নিতাইর সংজ্ঞা নাই দেখিয়া নিমাই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। প্রভুর সুকোমল কর স্পর্শে নিতাই বাহু জ্ঞান পাইলেন, কিন্তু উঠিলেন না। তখন নিমাই বলিলেন “শ্রীপাদ, গাত্রোত্থান কর। কলির জীবগণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদের ঘোরতর দুর্দশা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তুমি মধুর সংকীর্ণন দ্বারা এবং জ্ঞান ধর্ম নিরীক্শেবে প্রেম বিতরণ করিয়া জীবগণকে উদ্ধার

কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও ? তুমি দয়ার
আধার, বিশ্বজনীন প্রেমের আকর ও ভক্তির সুবিস্ময় প্রস্রবণ।
তোমার প্রেম না পাইলে জীবগণের আর উদ্ধারের পথ নাই। তুমি
যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিতরণ কর। তোমার প্রতি যাহার বিন্দুমাত্র
বিদ্বেষ থাকিবে সে পাপিষ্ঠ নরাদম্য আমার অপ্রিয়; সে অনশ্বাক্ষ
চিত্তে আমাকে ভজনা করিলেও আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।”

“তিলান্ধক তোমারে যাহারে দ্বেষ রহে ।

ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

গৌর নিতাই উভয়েই যে শক্তিমান তাহা মহাপ্রভু নিজ মুখেই
বাক্য করিয়াছেন; সুতরাং নিতাই যে শ্রীভগবানের অবতার তাহাতে
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভুর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতাই স্তম্ভিত হইলেন।
এবং মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। “যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-
প্রলয় হইতেছে, যিনি সত্যময় কলেবর, সচ্চিদানন্দ, অত্যাচারীর দমন-
কারী, সাধুগণের ত্রাণ কর্তা, তিনিই শচী মাতার গর্ভে জন্ম ধারণ
করিয়াছেন। প্রভো, তোমার ইচ্ছায় এই জগৎ সংসার পরিচালিত
হইতেছে, তোমার তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না, তুমি যাহাকে অনুগ্রহ
কর, যাত্র সেই বুঝিতে পারে। প্রভু, তুমি সত্যযুগে কৃষ্ণাজিন-দণ্ড-
কমণ্ডলু ধারণ করিয়া জগতে তপোধর্ম প্রচার করিয়াছ, ত্রেতাযুগে
দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যজ্ঞ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়াছ,
দ্বাপরে নব-নীরদকাস্তি-বনমালাধারী বংশীবদন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ-

রূপে শ্রীবৃন্দাবনে মধুর লীলা প্রকাশ করিয়া জগতে পূজা ধর্ম প্রচার করিয়াছ, আজ শ্রীগোরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি-ধর্ম প্রচার দ্বারা মুক্তিপথ প্রদর্শন করিতে উত্তত হইয়াছ । প্রভু, তোমার অনন্তলীলা, অপার মহিমা ও বিশ্বজনীন প্রেম বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই । আজ তোমার দর্শনে কৃতার্থ হইলাম ।”

এইরূপে নিত্যানন্দপ্রভু স্তব করিলেন । মহাপ্রভু গুনিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন । অন্তর্ধ্যামী ভগবান এ সমস্তই জানেন, যিনি ভগবানের অবতার, ভিন্ন দেহ এক প্রাণ (“অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত ।”) আজ তিনিই মহাপ্রভুর স্তব করিতেছেন, এই জগতই মহাপ্রভু লজ্জিত হইলেন ।





নবম অধ্যায় ।



শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ ।

“গৃহীয়াৎ যবনীপাণিং বিশেষা শৌণ্ডিকালয়ং ।

তথাপি ব্রহ্মণোবন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজং ॥”

নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বয়স যদিও বত্রিশ বৎসর, কিন্তু বালক স্নলভ চাকল্য তাঁহার এখনও দূর হয় নাই । শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনী দেবীকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন । বহুদিনের পরে মাতাকে পাইয়া নিতাই আনন্দে বিভোর হইলেন, নিজ হাতে ভাত খান না, মালিনীদেবী নিজ শিশু পুত্রের জায় তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দেন । কখনও মালিনীর স্তন্য পান করেন, কখনও তাঁহার ক্রোড়ে শুইয়া পড়েন । কোন কোন-দিন স্নান করিতে যাইয়া গঙ্গায় সন্তরণ করেন, পুনঃ পুনঃ ডাকিলেও উঠেন না ; কিন্তু নিমাই ডাকিলেই অমনি দৌড়িয়া আসেন । এই-রূপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বুত বাল্যভাব দেখাইতে

লাগিলেন, মালিনীদেবীও তাঁহাকে অপত্য নির্দিশেবে পালন করিতে লাগিলেন। জগতের জীব দেখিল যে স্বয়ং ভগবান আজ পুত্ররূপে জীবাসের ঘরে লীলা করিতেছেন।

ইতিমধ্যে এক দিবস নিমাই জীবাস পণ্ডিতের সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময় বলিলেন, “পণ্ডিত তুমি এই অবস্থাকে ঘরে রাখিয়াছ কেন ? তুমি ইহার জাতি কুল কিছুই জান না, এই অজ্ঞাত কুলীন অবস্থাকে ঘরে রাখিয়া নিজের জাতি কুল নষ্ট করিতেছ কেন ? যদি আশ্চর্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শীঘ্র এই অবস্থাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও”। বিশ্বস্তরের এই কথা শ্রবণ করিয়া জীবাস পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন “প্রভু, এরূপ ভাবে পরীক্ষা করা তোমার উচিত নহে। আর আমাকে ছলনা করিও না, আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাকে যে ব্যক্তি একদিনও ভজনা করে সেও আমার প্রাণ তুল্য, আর নিত্যানন্দ ও তুমি অভিন্নদেহ, কাজেই তাঁহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। নিত্যানন্দ যদি মত্ত পান করে, কিম্বা যবননী গ্রহণ করে অথবা যদি আমার জাতি কুল মানও নষ্ট করে তথাপি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না।”

“দিনেক যে তোমা ভজে, সে আমার প্রাণ ।

নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হতে প্রমাণ ॥

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ঘরে ।

জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে ॥

তথাপি আমার চিন্তে নহিব সন্দেহ ।

সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন নিমাই ভগবান ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন “পণ্ডিত ! নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতই দৃঢ় বিশ্বাস ? আচ্ছ জানিলাম তুমিই নিত্যানন্দের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছ। আমি তোমার নিত্যানন্দ প্রীতিতে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিতেছি যে যদি স্বয়ং লক্ষ্মীও নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য থাকিবে না এবং তোমার বাড়ীর সকলেরই আমার প্রতি অচলা ভক্তি হইবে। আমি নিত্যানন্দকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও।”

“যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে ।

তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥

বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ীর ।

সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥”

নিমাই এইরূপ বর দিয়া চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ প্রেমে ঢল ঢলায়মান, তাঁহার ভ্রমণশীলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সমস্ত নদীয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও গঙ্গায় সন্তরণ করেন, কখনও বালকগণের সহিত ক্রীড়া করেন, কখনও গঙ্গা-দাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করেন, কখনও মুন্সারি গুপ্তের গৃহে গমন করেন; এইরূপে দিন দিন বাল্যভাব দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় নিত্যানন্দ মাঝে মাঝে বিশ্বস্তরের বাড়ীতে গমন করিতেন, নিজাইকে দেখিয়া শচীমাতা বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন নিত্যানন্দ বাল্যভাবে বিহ্বল হইয়া যেই শচীমাতার পাদপদ্ম ধরিতে গিয়াছেন, অসম্মিত তিনি দৌড়িয়া গৃহে গমন করিলেন। ক্রমশঃ এই সকল বাল্যভাব দেখিয়া

শচীমাতার দিন দিন নিত্যানন্দের প্রতি স্নেহ বাড়িত হইতে লাগিল । একদিন শচীমাতা নিমাইকে বলিলেন “বাণ নিমাই, অতঃপর রাত্রিতে একটি অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি । তুমি আর নিত্যানন্দ দুইজনে যেন পাঁচ বৎসরের দুইটা শিশু হইয়া পরস্পর মারামারি করিয়া দেখাইতেছ । কখনকাল পবে উভয়েই ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ, কৃষ্ণ এবং তুমি বলবাম হাতে লইয়া বাহির হইলে ; এবং আমার সাক্ষাতেই চারিজনে দধি দুগ্ধ স্নেহাদি লইয়া মারামারি করিতে লাগিলে । রাম কৃষ্ণ ঠাকুর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন “কে তোরা এরূপ করিতে-
ছিস্ বাহির হইয়া যা, এ সকল জিনিষ আমাদের । পরে বলরাম কৃষ্ণের দোহাই দিয়া যেন নিত্যানন্দের প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিল, নিত্যানন্দ বলিল “গৌরচন্দ্র যখন আমার ঈশ্বর, তখন তোর কৃষ্ণকে আমি কিছুতেই ভয় করি না । এই বলিয়া চারিজনে কাড়া-
কাড়ি করিয়া দধি দুগ্ধ আদি ভোজন করিতে লাগিল । পরে নিত্য-
ানন্দ আমাকে মাতৃ স্নেহাধন করিয়া বলিল, “মা, আমার বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও ।” এই কথা শুনিতে শুনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ।” স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিমাই হাসিতে লাগি-
লেন এবং বলিলেন “মা ! তুমি অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছ, আর কাহারও নিকট এই স্বপ্নের কথা বলিও না ।” তোমার ঘরের দেবতা বড় জাগ্রত, তোমার কথার আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল । আমিও অনেকদিন দেখিয়াছি নৈবেদ্যের কতকংশ অস্বাদ্য হয় ; মনে করিতাম তোমার বধুরই এই কাজ, এই বলিয়া লজ্জার কাহারও নিকট এ কথা বলি নাই । অতঃপর আমার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল ।

“তোমার বধুরে মোর সন্দেহে আছিল ।

আজি সে আমার মনে সন্দেহ খুঁটিল ॥”



দশম অধ্যায় ।

—♦♦♦—

নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভর ।

“নিত্যানন্দ মাতৃ ভাব পাই শচী রাণী ।

নয়নে গলয়ে জল গদ গদ বাণী॥”

পর দিবস বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের নিকট গমন করিয়া বলিলেন “শ্রীপাদ, আজ আমার বাড়ীতে আপনার ভিক্ষা হইবে। কিন্তু প্রভু, আর একটি কথা বলি বাড়ীতে যাইয়া কোনরূপ চাকল্য প্রকাশ করিবেন না।” ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ দুই কাণে হাত দিয়া বিষ্ণু শ্রবণ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন “প্রভু, এরূপ কথা আমাকে বলিও না, যাহারা পাগল তাহারাই চাকল্য প্রকাশ করে; নিজে চঞ্চল তাহাতেই বুকি সকলকেই চঞ্চল বলিয়া মনে কর।” এই বলিয়া দুইজনে হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কথা আলাপ করিতে করিতে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া গদাধর, ঈশান প্রভৃতি

বিশ্বস্তরের পরম আত্মায়গণ পদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত জল দান করিলেন । নিমাই বলিলেন “মা, আজ তোমার আর একটা পুত্রকে আনিয়াছি, ইহাকে তোমার বিশ্বরূপ বলিয়া মনে করিবে।” শচী আনন্দিতা হইয়া নিতাইর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন যেন স্বয়ং বিশ্বরূপই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ।

শচী কথা কহিতে পারিতেছেন না, দুই নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, বিশ্বরূপ অনেকদিন হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদিন পরে তাঁহার সেই অমূল্য নিধিকে পাইয়া একবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন । একবার মনে করিলেন একি আমার সেই প্রিয়তম বিশ্বরূপ ? পুনরায় ভাবিতেছেন না, সে তো অনেকদিন হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, বোধ হয় নিমাই আমার সঙ্গে কৌতুক করিতেছে । কিছুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাইকে বলিলেন “দেখ বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র, সত্যই কি তুমি আমার সেই বিশ্বরূপ ?” নিতাই বলিলেন “হাঁমা, আমি তোমার বিশ্বরূপ ।” তখন শচীমাতা পরমানন্দে নিতাইকে কোলে লইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । এবং বলিলেন ভগবান্ এতদিনে আমার কষ্ট দূর করিলেন, আমি নিমাইর জন্ম সর্বদাই চিন্তা করিতাম, আমার নিমাইর সাহায্যকারী কেহই ছিল না, এখন তুমিই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ।”

“নিত্যানন্দ মাতৃভাব পাই শচী রাণী ।

নয়নে গলয়ে জল গদ গদ বাণী ॥

এইমত স্নেহরসে সব গর গর ।

দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর ॥”

তাহার পর নিমাই বলিলেন, “মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমা-
দিগকে খাইতে দাও।” শচীমাতা পরমানন্দে পরিবেশন করিতে
লাগিলেন। পরিবেশন করিতে করিতে শচী নিতাইর পানে চাহিলেন
দেখিলেন যেন দুই ভাই পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়াছেন, একজন
গুরুবর্ণ, অগ্র জন কৃষ্ণবর্ণ। দুই জনের অপূৰ্ণ রূপ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র,
গদা, পদ্ম, ত্রীহল, মুম্বল আদিতে সুশোভিত হইয়া যেন হস্ত বলরান
রূপে ভোজন করিতেছেন। তাঁহার পুত্রবধূ যেন কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে
অবস্থিতা আছেন। এই অপূৰ্ণ দৃশ্য দেখিয়া শচী মুগ্ধিতা হইয়া
পড়িলেন, অশ্রুজলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র সিঁড় হইল এবং সমস্ত ঘর
অন্নময় হইল। শচীমাতার শরীরে অশ্রু, কন্ম, পুলকাদি ভক্তিতে
উদ্দীপক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইল।

ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া শচীমাতার গায়ে
হাত দিয়া বলিলেন, “মা উঠ। তুমি হঠাৎ মুগ্ধিতা হইলে কেন?
চিন্তা স্থির কর।”

কিছুক্ষণ পরে শচী বাহুজ্ঞান লাভ করিয়া তাড়াতাড়ি কেশরাশি
বন্ধন করিলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।
ঈশান সমুদয় গৃহ পরিষ্কার করিলেন। শচীমাতা জ্ঞানলাভ করিয়া
গৌর নিতাই দুই ভাইকে সুন্দর বেশভূষণে সাজাইলেন এবং নিত্যা-
নন্দের মুখচন্দ্র পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমাই
বলিলেন, “মা, ইহাকে নিজ পুত্র বলিয়া জানিবে এবং আমা অপেক্ষা
অধিক যত্ন করিয়া পালন করিবে।” এইরূপে সে দিনকার লীলা
শেষ করিলেন।

অন্য একদিন মহাপ্রভু তাঁহার পার্শ্বদগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া
আছেন, নিত্যানন্দ তাঁহার দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়াছেন। এমন

সময় ত্রীল মুরারি গুপ্ত অগ্রে নিত্যানন্দের চরণে প্রণাম করিয়া পরে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন । তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হস্ত করিয়া মুরারিকে বলিলেন, “গুপ্ত, এ তোমার কিরূপ ধর্ম ?” মুরারি বলিলেন, “প্রভো, আমি ধর্ম্যাধর্ম কিছুই জানি না, তুমি যাহা করাও আমি তাহাই করি । বায়ু কর্তৃক যেরূপ শুষ্ক তৃণ চালিত হয়; সেইরূপ জীবগণও তোমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে ।

“পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে ।

জীবের সকল ধর্ম তোর শক্তি বলে ॥”

জীবের নিজের ক্ষমতা কিছুই নাই, সে নিমিত্ত কর্তামাত্র ; তুমি যাহাকে শক্তিদান কর সেই শক্তিমান হয় ।”

মুরারির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, “মুরারি, সত্যি তুমি আমার পরম ভক্ত, তুমিই নিত্যানন্দের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছ, বস্তুতঃ নিত্যানন্দের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, সেই আমার প্রিয়, আর নিত্যানন্দের প্রতি যাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ থাকে, সে দাস হইলেও আমার প্রিয় হইতে পারিবে না ।”

“সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস ।

তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে ।

দাস হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥”





একাদশ অধ্যায় ।



দিগম্বর নিত্যানন্দ ।

“ভক্ত পদধূলি, আর ভক্ত পদজল ।

ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল ॥

এই তিন সেবা হ’তে কৃষ্ণপ্রেম হয় ।

পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কর ॥”

(চৈতন্য চরিতামৃত ।)

শ্রীগোরাঙ্গের প্রেম-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা নিত্যানন্দকে নিত্য নিত্য নূতন ভাবে নাচাইতে লাগিল। একদিন শ্রীগোরাঙ্গ দিবাভাগে শয়ন মন্দিরে বসিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াসহিত বিশ্রান্তালাপ করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাই প্রেমে বিভোর, পরিধান বস্ত্র খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, নয়নে জলধারা বহিতেছে। নিত্যানন্দের এই প্রকার দিগম্বর বেশ দর্শন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় দূরে পলায়ন করিলেন। নিতাই কখনও হাসিতেছেন,

কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও জোরে জোরে লক্ষ প্রদান করিয়া আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন । কৃষ্ণপ্রেমে নিতাইর বাহুজ্ঞান একবারে শূন্য হইয়াছে । শ্রীগৌরাঙ্গ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়াই নিতাইকে ধরিবার জ্ঞান দৌড়িয়া আসিলেন । মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্রই নিত্যানন্দ আনন্দে অধীর হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দকে ধরিয়া নিজের মস্তকের বস্ত্র পরাইয়া দিলেন । ভক্তগণ আসিয়া সকলে মিলিত হইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন নিজ হস্তে গন্ধ মালাদি দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করিয়া তাঁহাকে ভক্তগণের মাঝখানে বসাইলেন । মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর পদ-প্রক্ষালন করিয়া দিলেন । এবং অন্ত্যাত্ম ভক্তগণকে বলিলেন, “তোমরা সকলে নিত্যানন্দের পাদোদক পান কর, ইহা পান করিলে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে ।”

“ভক্ত পদধূলি, আর ভক্ত পদজল ।

ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল ॥

এই তিন সেবা হ’তে কৃষ্ণপ্রেম হয় ।

পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥”

(চৈতন্য চরিতামৃত ।)

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিতে লাগিলেন । কে আগে যাইয়া নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিবেন, এই উৎকর্ষায় বৈষ্ণবগণ সকলেই অতি ব্যাকুল ভাবে নিত্যানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিয়া ভক্তবৃন্দের আশা মিটিতেছে না, এক

এক জন ৫৭ বার করিয়া পান করিতে লাগিলেন । এবং ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, “আজি জীবন সার্থক হইল, ভববন্ধন মুক্ত হইল, শরীরের সকল পাপ দূর হইল ।” যে পাদপদ্ম হইতে পতিত উদ্ধারিণী কলুষনাশিনী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, যে পাদপদ্ম লাভ করিবার জন্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও ব্যস্ত, যে পাদপদ্মের ছায়া স্পর্শের জন্ত যোগী পাষিগণ ব্যাকুল, সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের পাদোদক ভক্তগণ মহানন্দে পান করিলেন ।

ইহাপেক্ষা তাঁহাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? নিত্যানন্দের পাদোদকের এমনই শক্তি যে পান করিবামাত্রই ভক্তগণ সকলেই ভগবৎ প্রেম লাভ করিলেন, তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা দূর হইল, ত্রিতাপ জ্বালা দূরে গেল, হৃদয় পবিত্র হইল । সকলে প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরানন্দ কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে ছিলেন, শ্রীগৌরানন্দের নৃত্য দর্শনে আর থাকিতে পারিলেন না, অমনি আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন । গৌর নিতাই হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিলেন ।

নিত্যানন্দের পাদ-বিক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল । ভক্তগণ গৌর নিতাইকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । সকলেই প্রেমে আত্মহারা, বাহুজ্ঞান শূন্য, কেহ হাসিতেছেন, কেহ *লাঁদিত্তেছেন*, কেহ *গাইতেছেন*, কেহ *মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন*, কেহ “হরি বোল” “হরি বোল” বলিতেছেন, কেহ বা গড়াগড়ি বাইতেছেন । নবদ্বীপ আজ আনন্দধাম । নবদ্বীপে আজি সুখের হিলোল প্রবাহিত হইয়াছে, নবদ্বীপবাসী সংসার ভুলিয়া গিয়াছে, প্রাণের আকুলতায় আত্মহারা হইয়াছে । গৌর নিতাই অপার আনন্দে বিভোর হইয়া

নাচিতেছেন, খেলিতেছেন, গাইতেছেন । বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবল প্রবাহে প্রভুর প্রভুত্ব, ভক্তের লবুত্ব, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, মুখের মুখত্ব সকলই ভাসিয়া গিয়াছে । যেন সকলেরই শরীর হইতে ভগবৎ প্রেমের অপূৰ্ণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সকলেই প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় পরমানন্দে নৃত্য করিতেছেন । চতুর্দিকে ঘন ঘন হরিধ্বনি হইতেছে । এইরূপে বহুক্ষণ লীলাখেলা করিয়া গৌরগনিতাই স্তম্ভিত হইলেন । তখন শ্রীগোরাঙ্গ নিত্যানন্দের পানে তাকাইয়া বলিলেন, “শ্রীপাদ, তোমার একখানা কোপীন আমাকে দাও ।” এই কথা শুনিয়া নিতাই হাসিতে লাগিলেন । এবং উভয়ে কিছুক্ষণ চাওয়া চাহির পর শ্রীগোরাঙ্গ নিজেই নিত্যানন্দের একখানা কোপীন আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈষ্ণবদিগকে বিতরণ করিলেন । বলিলেন, “ভক্তগণ ! তোমরা সকলে এই বস্ত্র মস্তকে বন্ধন কর ; নিত্যানন্দ ভগবানের অবতার, তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে ।”

“সকল বৈষ্ণব মণ্ডলীর জনে জনে ।

খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে ॥

প্রভু বলে এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে ।

অন্তের কি দায়, ইহা, বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই বলিয়া মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ মহিমা কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্য—নিত্যানন্দ, পূর্ণব্রহ্ম ! তাঁহাকে যে কিঞ্চিৎ আত্ম দ্বেষ করে সে ভক্ত হইলেও আমার প্রিয় নহে ।

“ইহান চরণ শিব ত্রক্ষার বন্দিত ।
 অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥
 তিলাঙ্কেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে ।
 ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥
 ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায় ।
 তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্বথায় ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এইরূপে শ্রীগৌরানন্দ নিত্যানন্দ মহিমা সাধারণে প্রচার করিতে
 লাগিলেন ।





দ্বাদশ অধ্যায় ।



বাঙ্গালার অবস্থা ।

“যদা যদাহি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং হৃজাম্যহং ॥”

(গীতা ।)

শ্রীগৌরাজ যে সময়ে আবিভূত হইয়াছিলেন সে আজ চারি শত বৎসরের অধিককালের কথা । এই সময় হোসেন খাঁ নামক জনৈক পাঠান গোড়ের রাজা ছিলেন । ইনি ইতঃপূর্বে গোড়ের হিন্দু রাজা সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন । সুবুদ্ধি রায় যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় তিনি হোসেন খাঁর অবৈধকার্য্যের নিমিত্ত এক সময় তাঁহাকে চাবুক মারিয়া ছিলেন । হোসেন খাঁর হৃদয়ে এই বিদ্বেষ-বহ্নি তুবানল প্রায় জ্বলিতেছিল, হোসেন খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্ব প্রভুর প্রাণ বধ না করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে যবনের জল পান করাইয়া ছিলেন । পরে তিনি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করার

জ্ঞান কানীধামে যাইয়া শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া হরিনাম করিতে উপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে তিনি বৃন্দাবনে বাস করেন । এই মুসলমান রাগার অধীনে কাজী উপাধিধারী কয়েকজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন, ইহারা সৈন্ত-সামন্তে বেষ্টিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন । ইহাদের মধ্যে নবদ্বীপের অন্তর্গত বেলপুখুরিয়া গ্রামনিবাসী চাঁদকাজী, মুলুককাজী ও শান্তিপুরের নিকটবর্তী গোরাই কাজী প্রধান ছিলেন । ইহারা হিন্দু-দিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন । এই সময় ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহারা ধর্মকর্ম্য করিতেন এবং অত্যাচার জাতীয় লোক তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায় করিতেন । ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ কদাচিৎ রাজকর্ম্য করিতেন, ইহারা সমাজে অত্যন্ত রণিত বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন । শ্রীজগন্নাথ রায় ও মাধব রায় বলিয়া দুই জন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে কোটালের কর্ম্য করিতেন, ইহারা শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহারা ইজগাই মাধাই বলিয়া বিখ্যাত ।

এই সময় বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপই বিদ্যা, বাণিজ্য ও সভ্যতাতে সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল । নবদ্বীপের সর্বত্রই বিদ্যাচর্চা হইত । বিদ্বান্কে সকলেই আদর করিত, মুখকে পশুবৎ ঘৃণা করিত । সমাজের অধিকাংশ লোকেই শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবের সংখ্যা নামমাত্র ছিল ।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীই এ সময়ের প্রধান সাহিত্য ছিল । এই সকল পদাবলী বৈষ্ণবগণ ভক্তি-সহকারে পাঠ করিতেন । বক্তব্য : বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা অমৃতের উৎস স্বরূপ ; পড়িলে *ভক্তিরসে হৃদয় স্বতঃই আর্দ্র হইয়া যায়* । স্বয়ং মহাপ্রভুও এই কবিতা শুনিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেন ।

“চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতি, রায় নাটক গীতি,

কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥”

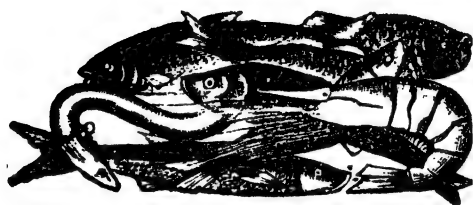
(চৈতন্য চরিতামৃত ।)

জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্কভৌম তখন নবদ্বীপের সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এই সময় অসাধারণ প্রতিভাশালী রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা যাইয়া সমগ্র জায় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে জায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। প্রধান স্মার্ত রঘুনন্দন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দ ও তন্ত্রশাস্ত্রের রাজা কুব্জানন্দ প্রভৃতি ইহার ছাত্র ছিলেন। তখন নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে বিজ্ঞাচর্চার প্রধান স্থান হইয়াছিল।

যদিও বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপে তখন সর্বতোমুখী উন্নতিই বিद्यমান ছিল বটে; কিন্তু একটা বিষয়ের বড়ই অভাব দৃষ্ট হইত। ধর্মচর্চা একবারেই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, শুধু নবদ্বীপ বলিয়া কেন সমগ্র বঙ্গদেশেই ধর্মরাজ্যে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

হীন চরিত্র তান্ত্রিকগণের পাশবিক অত্যাচারে, মুসলমান রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতায়, বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের ধর্মভাব বিহীন শুষ্ক মায়াবাদে, মানবহৃদয়ের ভক্তিবৃত্তি একরূপ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সমাজ অবনতি নদীর অতি হেয়তম নিয়চড়ায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জায়শাস্ত্রের কূট তর্ক লইয়াই বিব্রত থাকিতেন, সমাজে যাহারা ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাঁহারাও স্বভিষ্যাস্ত্রের ব্যবস্থা পালনকেই স্বর্ণের প্রশস্ত সিঁড়ি বলিয়া মনে

করিতেন। বাস্তবিক ধর্ম্যভাব একবারেই শূন্য হইয়াছিল। তখন উন্নতিশীল নবদ্বীপেও বাহুবল এবং জ্ঞানবলেরই প্রাধান্য ছিল। এক দিকে প্রবল প্রতাপ প্রতাপ রুদ্র ও চাঁদকাজির বাহুবল অতৃদিকে বাসুদেব সার্কভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জ্ঞানবল। বঙ্গদেশে আধ্যাত্মিক অবনতির এই ঘোরিতর দুর্দিনে শ্রীভগবান্ স্বয়ং চৈতন্যদেব রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া এই উভয় শক্তির মধ্যে ভক্তিবলের প্রাধান্য স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন।



শ্রীগোরাঙ্গ পরম দয়ালু। জীবের দুঃখে সর্বদাই কাতর, ধর্মের বিমল
সুখ লাভ করিয়া মানবগণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক
এই ত্রিবিধ দুঃখ দূর করুক ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা।

এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল হইয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে
বলিলেন, “শ্রীপাদ, তুমি আর হরিদাস আমার সহায় হও। এ কার্য
অন্ত দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। তোমরা এই নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া
শ্রীহরি নাম প্রচার কর এবং কি ছোট, কি বড়, কি মুখ, কি পণ্ডিত,
কি সাধু, কি অসাধু জাতি যথার্থ বিবিশেষে সকলকেই এই মধুর হরি
নাম দিয়া উদ্ধার কর।”

“পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম।

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

কাহারো হৃদয়ে নহিবেক দুঃখ শোক।

সংকীৰ্ত্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্বলোক ॥”

(চৈতন্য মঙ্গল।)

হরিদাস ও নিত্যানন্দ উভয়েই সন্ন্যাসী, পরম দয়ালু ও শক্তি সঞ্চার-
ক্ষম। কাজেই উপযুক্ত লোকের উপর এই মহৎকার্যের ভার গুস্ত
হইল। এক্ষণে শ্রীগোরাঙ্গ ধর্মরাজ্যের স্বাধীন রাজা এবং নিত্যানন্দ
তাঁহার প্রধান সেনাপতি হইলেন। ধর্মবীর নিত্যানন্দের হরিনাম
ভেরীর বিজয় নিনাদে দিগ্ভ্রমল মুখরিত হইয়া উঠিল। দলে দলে
লোক আসিয়া তাঁহাদের ভক্ত হইতে লাগিল, চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ
হইল; নবদ্বীপে এই প্রথম রীতিমত হরিনাম প্রচার আরম্ভ হইল।
হরিদাস নিত্যানন্দের সহকারী হইলেন। এখানে প্রসঙ্গাধীন হরিদাসের
বিবরণ কিছু বলা যাইতেছে। ইহার বাড়ী বনগ্রাম মহকুমার অধীন

বুঢ়ন গ্রামে । ইনি 'ব্রাহ্মণ পুত্র, মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া যবন হরিদাস নামে খ্যাত । ইনি পরম ভক্ত ছিলেন, হরিনামের প্রতি তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ছিল । তিনি বনগ্রামের নিকট বেনাপোলের জঙ্গলে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় হরিনাম জপ করিতেন ।

বনগ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খাঁন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক, অত্যাচারী ও ভক্তদ্রোহী । হরিদাসের ভজন সাধন তাঁহার ভাল বোধ হইল না । তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত একটা পরমা-সুন্দরী যুবতী বেঞ্চাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন । হরিদাস ভগবদ্ভক্ত । তাঁহার শরীরের অপূর্ণ জ্যোতিঃ ও গবনিষ্ঠা দেখিয়া সেই বেঞ্চার মন ভক্তিরসে আগ্রত হইল । তখন সে পাপ প্রযুক্তি পরিত্যাগ পূর্বক হরিদাসের শ্রীচরণ আশ্রয় করিল । হরিদাস তাঁহাকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন । যবন হরিদাস হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া মুসলমান কাজি মুলুকপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেলেন । হরিদাসের অমায়িক ভাব, ভগবদ্ভক্তি ও বিনয় দেখিয়া মুলুকপতির কঠিন হৃদয় কোমল ভাব ধারণ করিল । কিন্তু তিনি তাঁহার মস্তীর অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলেন না । মস্তী গোড়াই কাজি বলিল, “হরিদাসের সমুচিত শাস্তি না দিলে মুসলমান ধর্মের বিশেষ অনিষ্ট হইবে ।”

তখন মুলুকপতি বাধ্য হইয়া হরিদাসের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন । এই প্রাণদণ্ডও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে করিতে আদেশ করিলেন । তাঁহাকে বাইশ বাজারে লইয়া প্রত্যেক বাজারে বেত্রাঘাত করিতে হইবে । এমন কঠোর দণ্ডের নাম শুনিয়াই শরীর শিহরিয়া উঠে ; কিন্তু হরিদাসের হৃদয় বিচলিত হইল না । তখন গোরাই কাজি

বলিল, “হরিদাস ! যদি তোমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও তবে এখনও কলমা পড়, হরিনাম ছাড়। হরিদাসের হরিনামে অচলা ভক্তি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ! তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

“খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম ॥”

তখন হরিদাসকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইয়া ঘাতকগণ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিদাস বদন ভরিয়া উঠেঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদনে বেত্রাঘাত জনিত কষ্টের কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

ভগবান্ হরিদাসের দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। হরিদাস কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীব-জগতে নামের মহিমা প্রকাশ করিলেন। প্রেমের পরীক্ষা আত্মদানে। আজ হরিদাস ভগবানের জন্ত আত্মদান করিতেছেন, হরিদাসের পক্ষে ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে এই ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তিনি উঠেঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন এবং ঘাতকদিগের আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “প্রভু, ইহাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর।” এইরূপে হরিদাস বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন মুসলমানগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কিছুকাল পরে চেতনা পাইয়া তিনি তীরে উঠিলেন। তাহার পর অদ্বৈত প্রভুর নিকট কিছুকাল থাকিয়া পরে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন এবং ক্রমশঃ তিনি মহাপ্রভুর প্রিয়তম ভক্ত হইয়া উঠেন। এই হরিদাস নিত্যানন্দের সঙ্গী হইলেন, ইহাতে নিত্যানন্দের আনন্দের

সীমা রহিল না । নিত্যানন্দ যে প্রেমের উৎস, হরিদাসের সাহচর্য্যে তাহা বেগবর্তী নদী হইল । তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া নদীয়ার ঘরে ঘরে বেড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—

“কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ সে জীবন ;
 হেন কৃষ্ণ বল ভাই, হই এক মন ।
 যে না লয় তারে কয় দস্তে তৃণ ধরি ।
 আমাকে কিনিয়া লও বল গৌর হরি ॥
 তোসবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার ।
 শুন ভাই ! গৌরাজ্জ সুন্দর নদীয়ার ॥”

দুইজন নবীন সন্ন্যাসী প্রভাতে “শ্রীহরি নাম” প্রচার করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ফিরিতে লাগিলেন । সন্ন্যাসী দেখিয়া সকলেই ভীত হইয়া ভিক্ষা দিতে আসিত ; তাঁহারা বলিতেন, “ভাই ! তোমরা কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজ এই আমাদের ভিক্ষা ; আমরা অন্য ভিক্ষা চাই না ।” এই বলিয়া ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়া যাইতেন । এইরূপে তাঁহারা ঘরে ঘরে নাম বিলাইতে লাগিলেন । এই সময় বৈষ্ণব পদকর্তা বলিয়াছেন,—

“ভজ গৌরাজ্জ, কহ গৌরাজ্জ, লহ গৌরাজ্জ নাম রে ।
 যে জন গৌরাজ্জ ভজে সেই আমার প্রাণ রে ॥
 আমার নিতাই বলে হরি ব’লে কিনে লও আমারে ।
 যে জন সদা হরি ভজে রাখে প্রাণ মাঝারে ॥
 গৌর প্রেমে বাঁধা রহ ইহ পর জীবনে ।
 তাই বলি গৌর ভজ কায় মনো বাক্য প্রাণে ॥

সে জন আমার হয়, আমি হই তাহার রে ।

নিতাই যারে দেখে তারে বলে দস্তে তৃণ ধরি—

আমাকে কিনিয়া লও বল গৌর হরি ॥

এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় রে ।

সোণার প্রতিমা যেন ধূলায় লুটায় রে,

হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল রে ।

লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল রে ॥”

হুইজনেরই সুন্দর মূর্তি, সন্ন্যাসী-বেশ, অপূর্ব তেজঃ, বিশেষতঃ নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া অনেক লোক মুগ্ধ হইতে লাগিল । আবার অল্প দিকে কেহ কেহ মুগ্ধ না হইয়া বিক্রপ করিতে লাগিল । কেহ বলে ইহারা ভাল লোক নহে, প্রচুর ভাবে সন্ন্যাসী সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে, কেহ বলে ইহারা পাগল, এইরূপে নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল । বলাবাহুল্য ধর্মজগতে এরূপ দৃশ্য প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

নিত্যানন্দ স্বভাবতঃই একটু রহস্য প্রিয় ছিলেন, কাজেই হরিদাসের সহিত নাম বিলাইতে যাইয়া অনেক সময় চাকল্য প্রকাশ করিতেন, ইহাতে হরিদাসের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল । নিতাই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেই গঙ্গায় নামিয়া পড়িতেন, এবং নির্ভয় চিত্তে সন্তরণ করিতেন । হরিদাস তীর হইতে ডাকিতেন, “শ্রীপাদ. উঠ ।” নিত্যানন্দের সে দিকে দৃষ্টিমাত্র নাই, তিনি পরমানন্দে গঙ্গায় সন্তরণ করিতেন । ক্ষুধা লাগিলে পথিমধ্যে দুগ্ধবতী গাভী দেখিলেই অমনি দোহন করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন । কখনও বা বড় বড় ষাঁড় দেখিলে

লক্ষ দিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসিতেন এবং “আমি মহাদেব” এই বলিয়া চলিয়া যাইতেন । হরিদাস অত্যন্ত ধীর ; কাজেই তাঁহার এই সমুদয় চঞ্চলতা ভাল বোধ হইত না । নিত্যানন্দ ও হরিদাস এইরূপে অযাচিতভাবে নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন । এবং প্রেমাবিষ্ট চিত্তে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া গাইতে লাগিলেন,—

“কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,

প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায় ।

বইছে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায় ।

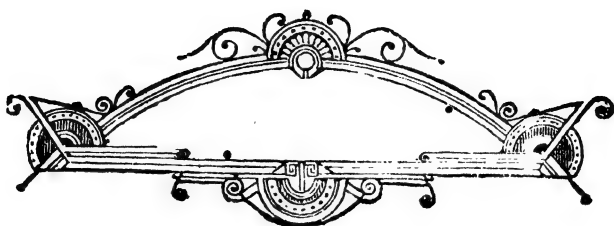
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,

রাধার প্রেমে বলরে হরি ;

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায় ।

রাধার প্রেমে হরি বাল, আয় আয় আয় ॥”

নিতাই ও হরিদাস উভয়েই ভক্তিমান, বিশ্বপ্রেমিক ও ভগবদ্রিষ্ঠ । সর্বজীবের হিতসাধনই তাঁহাদের প্রাণের ইচ্ছা । সুতরাং তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ না হইবে কেন ? সকলেই তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল । তাঁহারা হরিনামে দেশ মাতাইয়া উঠাইলেন । সর্বত্রই হরিনামের ধ্বনি উঠিতে লাগিল, আপামর সাধারণ সকলেই ভক্তিসাগরে ডুবিয়া গেল, নদীয়া নগরী প্রেমে টলমল করিতে লাগিল । নিতাই জ্ঞাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই অকাতরে প্রেমদান করিতে লাগিলেন । নদীয়াবাসী সকলেই হরি-সংকীর্ণনে মত্ত হইলেন ।



চতুর্দশ অধ্যায় ।

—ঃ*ঃ—

জগাই মাধাই ।

“অপি চেৎ সূতুরাচারো ভজতে মামন্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্য সমাগ্ ব্যবহিত হি সং ॥”

(গীতা ।)

নিতাই ও হরিদাস দুইজনে শ্রীহরি নাম প্রচার করিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দের হৃদয়ে এতদিন যে প্রেমের প্রবাহ অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্রনদীর তায় প্রবাহিত হইতেছিল, চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে তাহা স্বর্গীয়া মন্দাকিনীর শতধারায় প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবন করিতে উত্তত হইল ।

এই সময় হোসেন সাং গোড়ের রাজা ছিলেন । তাঁহার অধীনে জগন্নাথ ও মাধব নামক দুইজন ব্রাহ্মণ কুমার নবদ্বীপের প্রধান কোর্টালের কার্য্য করিতেন । ইঁহারা অত্যন্ত হীন চরিত্র ছিলেন ।

সর্বদা মত্তপান করিতেন, সুর্যোগ পাইলেই নগর লুটপাট করিতেন, নরহত্যা, চুরী-ডাকাভী প্রভৃতি কোন দুষ্টকর্মই ইহাদের অকরণীয় ছিল না। নিরন্তর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইহাদের হৃদয় পাষণ্ডতুল্য হইয়া গিয়াছিল, মানবের কাতর ক্রন্দনে ইহাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হইত না।

“সেই দুইজনের কথা কহিতে অপার :

তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর ।

লাঙ্গণ হইয়া মত্ত গোমাংস ভক্ষণ,

ডাকাচুরী পরগৃহে দাহে সর্বক্ষণ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

জগাই মাধাই একে নির্ধুর অত্যাচারী, তাহাতে রাজক্ষমতা লাভ করিয়া আরও ক্ষমতা দৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কাজিদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত রাখিয়া ইহারা সর্বদা অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে তখন সকলেই শঙ্কিত থাকিত। ইহারা এইরূপ বীভৎস অমানুষিক অত্যাচার করিয়াই অপার আনন্দ অনুভব করিত।

জগতে সকলেই সুখের জ্ঞাত ব্যস্ত। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল! জগৎ নিয়ন্তার কি সৃষ্টি বৈচিত্র্য!! যে সকলেই সমান সুখে সুখী হয় না, সকলেই একরূপ কার্য্যে ব্রতী হয় না, সকলের হৃদয়েই একই চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয় না। অথচ সকলেই সুখের জ্ঞাত ব্যস্ত। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে গঠিত, কাজেই কেহ পাপকার্য্য করিয়া সুখী, কেহ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৃপ্ত, কেহ দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে ব্যাকুল, কেহ অন্নের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিতে ব্যস্ত, কেহ ভগবৎ প্রেমে বিভোর, কেহ যুবতীর প্রেমে মত্ত, কেহ ঐহিক

সুখের জন্ম লালায়িত, কেহ পরকালের চিন্তায় মগ্ন, কেহ প্রভুত্ব লাভে সুখী, কেহ বিশ্বজনীন প্রেমে মাতোয়ারা, কেহ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যাকুল, কেহ মুখতা লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট, কেহ জিতেদ্রিয় হইয়া সুখী, কেহ ইন্দ্রিয় সেবায় পরিতৃপ্ত, কেহ আসঙ্গ লিপ্সায় ব্যাকুল, কেহ নির্জনবাসে প্রফুল্ল, কেহ পতিপ্রাণা সতী রমণীর পবিত্রপ্রেমে অনুরক্ত, কেহ বা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দৃশ্চরিত্রা পাপীয়সী কুলটার প্রণয়ে বিভোর। জীব-জগতে অগুণ্ণ এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে বাস্তবিক সুখ বুঝি এইরূপই পরিবর্তনশীল। নতুবা সুখাশ্রমী মানবের এইরূপ অবস্থান্তর হওয়ার কারণ কি? সকলেই যখন সুখের জন্ম ব্যাকুল তখন সুখের প্রকৃতি একরূপ বিভিন্ন কেন? কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে মানবগণ প্রকৃত যে সুখ তাহা লাভ করিতে ব্যগ্র হয় না, আপাতঃ মধুর পরিণাম-বিরস ক্ষণস্থায়ী যে সুখ তাহাই জীব আবেগ-ভরে অনুভব করে, বাস্তবিক তদ্বারা আত্মার পুষ্টিসাধন হয় না।

“চিন্তনদীনামু ভয়তো বাহিনী ;

বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ।

যাতু কৈবল্য প্রাগ্ভারা,

বিবেক বিষয় নিম্না সাকল্যাণ বহা।

সংসার প্রাগ্ভারা অবিবেক বিষয় নিম্নাপাপবহা।

তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয় শ্রোতঃ খিলী ক্রিয়তে,

বিবেক দর্শনাভ্যাসেন বিবেকশ্রোতঃ উদ্ঘাট্যতে।”

(পাতঞ্জল ভাষ্য।)

চিত্তরূপ নদী উভয় দিকে প্রবাহিত। উহা মঙ্গলের নিমিত্ত এবং

অমঙ্গলের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়। যে প্রবাহ কৈবল্য প্রাপ্তভরা বিবেক বিষয় নিয়া, তাহা কল্যাণকর ; যে প্রবাহ সংসার প্রাপ্তভরা অবিবেক বিষয় নিয়া তাহা দুঃখজনক। বৈরাগ্য দ্বারা বিষয় স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকানুশীলন দ্বারা বিবেক স্রোত প্রশস্ত হয়। জগাই মাধাই দুই ভাই সর্বদাই (২) রাজসিক*স্থখে মত্ত থাকিত, তাহাদের চিন্ত-নদী সংসার প্রাপ্তভরা ও অবিবেক বিষয় নিয়া ছিল।

কাজেই তাহারা সর্বদা অসংকর্ম দ্বারাই আপনাদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিত। ইহাদের দুর্দশা দর্শন করিয়া পরম দয়ালু নিতাইর হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি হরিদাসকে বলিলেন, “ভাই, এই দুইটা অধম পাপীকে উদ্ধার করিতে হইবে।”

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একদিন হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাম বিলাইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তাহারা দুইজনে জগাই মাধাইর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভাই তোমরা কৃষ্ণনাম কর।”

“কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ সে জীবন ;

হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই একমন।”

দুই ভাই মত্ত পান করিয়া বিভোর হইয়াছে, তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, বাহজ্ঞান শূন্য। যাহারা হরিনামের চির-বিরোধী, যাহাদের সম্মুখে এ পর্য্যন্ত কেহ ভগবদ্রাম কীর্তন করিতে সাহসী হয় নাই, আজ তাহারা নিতাইর মুখে হঠাৎ কৃষ্ণনামের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত নয়নে বলিল, “কোন্ বেটা এ সময় কৃষ্ণনাম করিয়া আমাদের অশান্তি জন্মাইতেছে? এত বড় স্পর্ধা! আমাদের নিকট কৃষ্ণ কথা! ইহাদের কি প্রাণের ভয় নাই? এখনই ইহাদিগকে ধরিয়া সমুচিত

শাস্তিপ্রদান করিতেছি।” এই বলিয়া দুই ভাই নিতাই ও হরিদাসকে ধরিবার নিমিত্ত দৌড়িতে লাগিল। নিতাই ও হরিদাস উভয়েই উদ্ধ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে হরিদাস বালিলেন, “শ্রীপাদ! তোমার যত অসম্ভব কার্যো হস্তক্ষেপ! যাহাতে সফলকাম হইতে পারিবে না এরূপ কার্যো হস্তক্ষেপ করাই অনুচিত। হা ভগবন্! আজ এই পাগলের সহিত আসিয়া বুঝি প্রাণটাই যায়।”

নিতাই বলিলেন, “আমার দোষ কি? যাহার আদেশে আসিয়াছ তাঁহার দোষ দিতে পার না? তিনি ঘরে বসিয়া আদেশ করিবেন আর আমরা পথে পথে গালাগালি গুনিব ও মার খাইয়া মরিব। ইহা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, “যাহা হউক মোটের উপর এমন মাতালের নিকট আমাদের যাওয়াই ভাল হয় নাই।” নিতাই বলিলেন, “আমার দোষ কি? তুমিই তো বলিলে, “চল জগাই মাধাইর নিকট যাই।” এখন অন্যায়রূপে আমাকে দোষী করিতেছ। যাহা হউক যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন একটা কথা বলি, “তুমি প্রভুর নিকট যাইয়া বল যে, এই দুইটা পাপীকে তোমার উদ্ধার করিতেই হইবে।” প্রজ্ঞাচক্ষু নিত্যানন্দ স্বয়ং ঐশী শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যে একথা বলিতেছেন ইহা স্মৃদু মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইজন্মই “কেহ কিছু না করয়ে চৈতন্য আজ্ঞা বিনা।” হরিদাস তখন হাসিয়া বলিলেন, “শ্রীপাদ! তোমার যখন ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছে, তখন বুঝিলাম যে এই দুই পাপী অবশ্যই উদ্ধার হইবে।”

এইরূপে আলাপ করিতে করিতে তাঁহারা দুইজনে যাইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। জগাই মাধাইর আনুপূর্বিক

সমুদয় বিবরণ জানাইয়া নিতাই বলিলেন, “প্রভু, আর আমরা তোমার আদেশ পালন করিতে যাইব না, হরিনাম বিলাইতে যাইয়া আজ আমরা বড়ই অপদস্থ হইয়াছি। জগাই মাধাই আমাদের প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে, ইহা দেখিয়া সকলেই আমাদের ঠাট্টা করে ও গালি দেয়, তাহারা বলে, “যেমন ইহারা ভণ্ডতপস্বী, তেমনই ইহাদের শাস্তি হইয়াছে। তুমি ঘরে বসিয়া কাজ কর, বাহিরের গঞ্জনা তোমাকে সহ্য করিতে হয় না, যত অত্যাচার আমাদেরই সহ্য করিতে হয়। সাধুকে সৎপথে আনা সহজ, ইহা সকলেই পারে ; কিন্তু পাপীকে সৎপথে আনা কঠিন। যদি তুমি দুরাচার পাপী জগাই মাধাইকে হরিনাম লওয়াইতে পার তবে সে তোমার মহিমা বুঝিতে পারি।”

প্রভু এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “শ্রীপাদ, তুমি যখন জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তাহাদের মুক্তি লাভ অনিবার্য।” ইহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং নিত্যানন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।





পঞ্চদশ অধ্যায় ।

নিত্যানন্দের প্রেম ।

“সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থ ভূতাহি সাধবঃ ।

কালে ফলন্তি তীর্থানি সদাঃ সাধু-সমাগম ॥”

নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাইর নিকট হরিনাম প্রচার করিতে বাইয়া তাড়া খাইয়াছেন। নিতাই পরম দয়ালু ও পর দুঃখে কাতর, জগাই মাধাই দুই ভাইয়ের এই দুর্দশা ও ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন। এই পাপী দুইটাকে যেক্ষণেই হউক উদ্ধার করিতেই হইবে ইহাই এখন নিত্যানন্দের মূলমন্ত্র হইল। একদা নিত্যানন্দ হরিনাম প্রচার করিতে নগরে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ জগাই মাধাইর নিকট উপস্থিত হইলেন।

জগাই মাধাই একে হরিনামের বিরোধী, তাহাতে সর্বদাই মদ্য

পান করিয়া বিভোর, বাহুজ্ঞান রহিত, কাজেই তাহারা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল কেরে বেটা ! এ সময় হরিনামের ধ্বনি করিতে-ছিন্ ? তোর নাম কি ? প্রভু বলিলেন “নিত্যানন্দ অবধূত ।”

“অবধূত ? তুই কি জানিস না যে জগাই মাধাই হরিনামের বিরোধী, জগাই মাধাইর নিকট হরিনাম করিলে আর তাহার রক্ষা নাই ? তুই জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভণ্ডামী করিতেছিন্, তবে দাঁড়া এখনি তোর সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি ।” এই বলিয়া মাধাই রোষ-কষায়িত-লোচনে অধর দংশন করিয়া নিত্যানন্দকে মারিতে ধাবিত হইল । জগাই মাধাইর অবস্থা দেখিয়া নিতাইর ভয় কি ক্রোধ হইল না ; কিন্তু তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া প্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি আন্তে ব্যস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন । মাধাই দেখিলেন যে সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত না হইয়া বরং অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, ইহাতে তাহাদের ক্রোধ আরও দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল । তাহারা দুই ভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল । প্রভুর করুণ দৃষ্টিতে হ্রাস্চারণের লৌহ তুল্য কঠিন হৃদয় নরম হইল না ।

“সে অরুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল ।

ক্রোধভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল ॥”

নিত্যানন্দ দুই ভাইকে দেখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বাপ্পাকুল-লোচনে বলিতে লাগিলেন “ভাই জগাই ! একবার হরিবল, বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও ।” জগাইর হৃদয় মাধাই অপেক্ষা একটু কোমল, কাজেই নিত্যানন্দের কাতরোক্তি তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল । সে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল ; কিন্তু মাধাইর হৃদয় কিছুতেই টলিল না, বিশেষতঃ

হরিনামের কথা শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল । তখন মহাক্রোধে এক ভগ্ন কলসীর কাণা তুলিয়া নিত্যানন্দের পবিত্র মস্তকে আবাত করিল । তাঁহার মস্তক হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল ।

“ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধায়ে,

নিত্যানন্দ মহাগ্রীভু গোবিন্দ স্মরণে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

পরম কারুণিক নিতাই মাধাইর দারুণ আবাতে ব্যথিত না হইয়া তাহারা দুই ভাই উদ্ধার হইবে ইহাই মনে করিয়া “গৌর” “গৌর” বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণের ধারার সহিত মিশিয়া গেল । তিনি বিশ্বজনীন প্রেমে আকুল হইয়া মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন ;—

“মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি,

তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি ।

মেরেছি সু মেরেছি সু তোরা তাতে ক্ষতি নাই,

সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥”

“ভাই ! মারিলি, মারিলি, তবু একবার মধুর হরি বলিয়া আমাকে কিনিয়া নে ।” এ ছবি জগতে অতুল্য । করুণার এই মধুর চিত্র দর্শন করিয়া দর্শকগণ স্তম্ভিত হইল । দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সমগ্র জগৎ নিস্তরুভাবে এই চিত্র দর্শন করিল । সমাগত জনসংখ্যার মধ্য হইতে দূরাগত বজ্র নির্যোষবৎ উচ্চ সাধুবাদ ধ্বনি উথিত হইতে লাগিল । যাহা কোন যুগে কোন ধর্ম্মবীর কর্তৃক প্রদর্শিত হয় নাই, আজ পরম কারুণিক নিত্যানন্দ বিশ্বজনীন প্রেমের

সেই অপূর্ব দৃশ্য প্রদর্শন করিলেন । ক্ষমা দ্বারা অক্ষমাকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে এবং ধর্মবল দ্বারা বাহুবলকে পরাস্ত করিলেন ।
প্রভো ! তুমি ধন্য ! না হইলে পতিতপাবন নাম ধরিবে কেন ?

নিত্যানন্দের এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়াও মাধাইর কঠিন-ক্লিশ-হৃদয় বিচলিত হইল না । যে ব্যক্তি আজীবন হত্যা কার্য্যে লিপ্ত আছে, যাহা কর্তৃক অমানুষিক বীভৎস কার্য্য সর্ব্বদা অমুষ্ঠিত হইয়াছে, যে নির্দয়ের মূর্ত্তিমান আদর্শ, তাহার হৃদয় কোমল হইবে কেন ? মাধাই পুনরায় নিত্যানন্দকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল ! জগাইর হৃদয় মাধাই অপেক্ষা কিছু কোমল, সে অনেক দুষ্কার্য্য করিয়াছে বটে ; কিন্তু এরূপ বিশ্বপ্রেমিক, উদারচেতা, ক্ষমাশীলের অপূর্ব্ব-চিত্র কখনও তাহার নেত্রপথে পতিত হয় নাই । সে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল, তাহার কঠিন ভাব দূর হইল, পাষণ্ড হৃদয় গলিয়া গেল । জগাই অমনি মাধাইর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল ।

“নিতাইকে আর মের না ও মাধাই ।

নিতাইর চাঁদবদন, দেখলে শীতল হয় জীবন,

আমার ইচ্ছা হয় যুগল চরণ হৃদে ধরে প্রাণ জুড়াই ।

নিতাইর মাথায় শিখা, উর্দ্ধরেখা, অঙ্গে হরির নাম লেখা,

কি অপরূপ ভঙ্গী বাঁকা রূপের সীমা নাই ।

ভক্তি-বসন নিয়ে গলে, পড়গে নিতাইর চরণতলে,

মাইর খাইয়ে দয়া করে এমন দয়াল দেখি নাই ।

নিতাইর সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, তাহে বহে প্রেমধারা,

ত্রিজগতে এমন দয়াল কভু দেখি নাই ;

মন্ত হরির নাম গানে, হরি বিনে নাহি জানে,
করে ধরি বিনয় করি মারিস্ নারে ও মাধাই ।
কত যোগীশ্বষি ব্রহ্মচারী, কতই পুরুষ কতই নারী,
প্রাণে মারি বিনাশ করি, দয়া করি নাই ;
আজ কেন প্রাণ এমন হ'ল, পূর্ব স্বভাব দূরে গেল,
চাঁদবদনে হরিবল, ডাকাতীর আর কার্য্য নাই ॥”

জগাই আরও বলিল, “মাধাই! ক্ষান্ত হও । এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি অতি নিষ্ঠুর! এই মধুর মূর্তি, এই বিশ্বজনীন প্রেম, দেখিয়াও কি তোমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? আর না, মাধাই! যথেষ্ট হ'য়েছে; এই বিশ্ববিমোহন চিত্র দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি এখন ক্ষান্ত হও ।”

“কেন হেন করিলে? নির্দয় তুমি দঢ়;
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়?
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর;
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার? ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই সংবাদ ক্রমশঃ মহাপ্রভুর নিকট পৌছিল । তিনি এই কথা শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ভক্তগণ সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন । আসিয়া দেখেন যে, নিত্যানন্দের বিশাল বপুঃ রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে । নেত্রযুগল হইতে অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে । এই অবস্থা দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর মুখ-চন্দ্র প্রভাতকালের শশধর অপেক্ষাও মলিন

হইল, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে যাইয়া নিতাইকে কোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং নিজ অঞ্চল দিয়া রক্ত মুছাইতে লাগিলেন ।

“নিতাইর অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে ।

আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ নেনহারে ॥

প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল ।

আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥

তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে ।

প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে ॥”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

নিতাইর অবস্থা দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । তাহার নেত্রযুগল হইতে টম্ টম্ করিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল । তিনি তখন মাধাইকে বলিলেন, “মাধাই ! তুই আমার নিতাইকে মারলি কেন ? ঐ দেখ্ নিতাইর চাঁদবদন শুকাইয়া গিয়াছে, মাধাই ! যদি তোর একান্তই মারিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে তুই আমাকে মারলি না কেন ?

“মাধাই ! যদি মারবো ব’লে ছিল তোর মনে ;

তবে মাধাই আমায় তুই না মারলি কেনে ?”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

নিত্যানন্দের অমানুষিক প্রেম ও অলৌকিক ক্ষমাশীলতায় জগাই মাধাই পূৰ্ণ হইতেই বিনম্র হইয়াছিল, এখন স্বয়ং মহাপ্রভুর রুদ্রমূর্তি ও দেবভেজঃ দর্শন করিয়া তাহারা একনারে মনোবধি-রুদ্ধ-বীৰ্য্য সর্পের

তায় মুগ্ধ হইয়া গেল । তখন মহাপ্রভুর শান্তভাবে দূর হইল, তিনি ক্রোধভরে রোষকষায়িত লোচনে তাহাদের দুই ভাইয়ের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন । “দুরাচার ! এতকাল পাপকার্য্য করিয়াও কি তোদের তৃপ্তিলাভ হয় নাই ? প্রস্তুত ঘসিতে ঘসিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তোদের পাষণ হৃদয় কি কিছুতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল না ? শ্রীমন্নিত্যানন্দের এই মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কি তোদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না ? এই সন্ন্যাসীকে মারিয়া তোরা কি লাভ করিলি ?”

জগাই মাধাই নদীয়ার মধ্যে বাহুবল ও রাজশক্তিতে বলীয়ান । এতকাল যাবৎ নানাপ্রকার বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে ; কিন্তু কোথাও এরূপ বজ্রনির্ঘোষ মর্ম্মস্পর্শী কল্কশ বাক্য শ্রবণ করে নাই, মহাপ্রভুর বাক্যগুলি যেন তাহাদের শরীরের প্রতি রন্ধে রন্ধে বিহ্বল-বেগে প্রবেশ করিল । যে জগাই মাধাই ইচ্ছা করিলে এরূপ শত শত ব্যক্তিকে সমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে, আজ তাহারা গৌর নিতাইর নিকট হিম-জীর্ণ ভুজঙ্গের তায় নিস্তরুভাবে দাঁড়াইয়া আছে । মুখে বাক্য নাই, নীরব, নিষ্পন্দ !! যাহারা কখনও কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই, আজ তাহারা সামান্য দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট মস্তক অবনত করিল, এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ; কিন্তু বলা বাহুল্য ভগবৎ শক্তির নিকট সকল গর্ভই খর্ব্ব হয় ।

এদিকে মহাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি ক্রমেই উদ্দীপিত হইয়া উঠিল । তিনি মহাক্রোধভরে বলিলেন, “পাপাত্মন ! তোরা নিরহঙ্কার, অক্রোধ পরমানন্দ প্রাণাধিক নিত্যানন্দকে আঘাত করিয়া পাপের পূর্ণতা সাধন করিয়াছিস্ । এখন তাহার সমুচিত শাস্তি গ্রহণ কর ।” জগাই মাধাই ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁপিতে লাগিল । মহাপ্রভু যে তাহাদিগের

প্রকৃত শাস্তা, একথা যেন তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। কঠিন অপরাধীর জন্ত মহাপ্রভু কিরূপ দণ্ডের আদেশ করিবেন, এই চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহারা মহাপ্রভুর দিকে সক্রূপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাস্ত্রের ভগ্নবস্ত্রাবের আবির্ভাব হইল। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। প্রভু সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের অবমাননা কিছুতেই সহ করিতে পারেন না। তাহাতেও নিত্যানন্দ প্রাণাধিক (“দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ”)। মহাপ্রভুর পক্ষে এটা বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিল। তখন তিনি মাধুর্য্য বিস্মৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভক্ত-বিদ্বেষীকে কঠোর দণ্ডপ্রদান করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইল। মহাপ্রভু স্বয়ং চক্রধর ; তখন তিনি তাঁহার সেই পাষণ্ডকুল নিস্কুলকারী ভক্ত-জীবন রক্ষাকারী অতুল শক্তিশালী সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন।

“রক্ত দেখি ক্রোধেতে বাহ্য নাহি মানে।

চক্র, চক্র, চক্র, প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

শ্রীগৌরাদ তখন ভগ্নবস্ত্রাবে বিভোর, তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে অমানুষিক প্রভা তীব্রবেগে বাহির হইতেছে। জগৎ দেখিল, উপস্থিত জনসাধারণ দেখিল যে, ভগবান্ এইরূপেই ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুকে সুদর্শন চক্র আহ্বান করিতে দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। তখন মুরারি গুপ্ত সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, মুরারি গুপ্তের শরীরে শ্রীহনুমান্ আবির্ভূত হইতেন। তখন মুরারি

গুপ্ত হনুমানভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “প্রভু, সুদর্শনকে আহ্বান করিতেছেন কেন? আমাকে আদেশ করুন, আমিই ঐ দুই বেটাকে সংহার করি।”

জগাই মাধাই উপস্থিত বিপদ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। যাহাদের জীবনে কখনও আতঙ্কের সঞ্চার হয় না, আজ সামান্য দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট তাহাদের হৃদয় সহসা দ্রুত দ্রুত করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, প্রত্যেক ধমনীতে রক্তপ্রোত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহারা দেখিতে পাইল যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত! সমুদয় জগৎ ঘুরিতেছে, মৃত্যুর ভীষণ চিত্র যেন সন্মুখে বেড়াইতেছে, আর সময় নাই, বৃষ্টি প্রাণ যায়।

অবস্থা অতি গুরুতর দেখিয়া নিতাই ত্রস্তভাবে মহাপ্রভুর চরণ ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “প্রভু, কর কি? ক্ষান্ত হও। এবার যে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিয়া মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে, তাহা কি ভুলিয়া গেলে? কলিযুগে নাম-প্রেমে জগৎ মাতাইতে আসিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশ কেন? সুদর্শন সম্বরণ কর, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। জগাই মাধাই: মহাপাপী, ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের সার্বকতা সম্পাদন কর। প্রভু, পাপীকে যদি উদ্ধার না কর তবে উদ্ধার করিবে কাহাকে? আর জগাইর তো কোন দোষ নাই, সে মাধাইকে মারিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছে। মাধাইও ভয়প্রদর্শন জন্ত একথণ্ড কলসীর কানা ছুড়িয়া ছিল হঠাৎ আমার মস্তকে লাগিয়াছে, এজন্ত আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করি নাই। অতএব প্রভু, তুমি এই দুইটা ভাইকে আমায় শিক্ষা দাও। আমি ইহাদিগকে লইয়া তোমার পতিতপাবন নামের মাহাত্ম্য রক্ষা করিব।”

“মাধাই মারিতে প্রভু ! রাখিল জগাই ;
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই ।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর ;
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিতাইর কাকুতি মিনতিতে প্রভুর ক্রোধ দূর হইতেছে না দেখিয়া নিতাই পুনরায় বলিলেন “প্রভু, আমি সত্য বলিতেছি মাধাইর আবাতে কিছুমাত্র দুঃখ পাই নাই । তুমি এই ভ্রাতৃ-যুগলকে তোমার শ্রীচরণে স্থান দিয়া উদ্ধার কর ।” এই সমস্ত কাতরোক্তিতেও মহাপ্রভু কোমল হইতেছেন না দেখিয়া নিতাই আবার বলিলেন “প্রভু, জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে । ইহার তো কিছুমাত্র দোষ নাই, তবে ইহার প্রতি ক্রোধ কেন ?” এই কথা শুনিবামাত্র প্রভুর কঠিন ভাবের পরিবর্তন ঘটিল । তিনি বলিলেন “তুমি বল কি ? এই জগাই তোমাকে রক্ষা করিয়াছে ? হারে জগাই ! তুই আমার প্রাণপ্রতিম নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করিয়াছিস ? তবে তো ভাই, তুই আমাকে কিনিয়াছিস ; আমি তোরই হইলাম । আমি তোকে কি দিব ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোকে অনুগ্রহ করুন, তোর কৃষ্ণ-প্রেম হউক ।” এই বলিয়া শ্রীগোরাঙ্গ প্রেমে বিহ্বল হইয়া মহাপাপী জগাইকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন ।

মহাপ্রভুর বিরিকি-বাহিত পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবামাত্র জগাই কৃষ্ণপ্রেমে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । তাহার দেহে ভক্তি উদ্দীপক সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইল । জগাইর শরীরের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া পুণ্যের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল । পাঠক !

ইহাকেই বলে “শক্তি সঞ্চার” । মহাপুরুষগণ এইরূপেই শক্তি সঞ্চার করিয়া পাষণ্ডদলন ও পাপী উদ্ধার করিয়া থাকেন। বস্তু শক্তি যে প্রকার বুদ্ধি বা জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যকরী হয়, ঐশীশক্তিও সেই প্রকার পাপ পুণ্য নির্ক্ৰি়শেষে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অগ্নি স্পর্শে স্বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, সাধু চরণ স্পর্শেও মানবগণ তদ্রূপ পবিত্র ভাব ধারণ করে। এই জন্তই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন,—

“সাধুনাম্ দর্শনং পুণ্যং তীর্থ ভূতাহি সাধবঃ ।

কালে ফলন্তি তীর্থানি সত্ত্বঃ সাধু-সমাগমঃ ॥”

জগাইর অবস্থা দর্শনে জনসাধারণ বিস্মিত হইল। ভক্তগণ মহা-নন্দে গৌর নিতাইর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে এই অপূর্ক দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। হরিনামের ধ্বনিতে দিগ্বাঙল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ জগৎ জানিল, ভক্তগণ দেখিল যে ভগবানের মহাশক্তির নিকট নদীয়ার রাজা জগাই মাধাইর বলদর্প ঐশ্বর্য্য গর্ক, অনুচিত প্রভুত্ব, সমুদয়ই ধর্ক হইল। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী মহোন্মাদে “জয় গৌরাঙ্গ” “জয় নিত্যানন্দ” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হইল দেখিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণসহ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

“ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া ।

জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া ॥”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

প্রায় চারি শতাব্দিক বৎসর অতীত হইল গৌর নিতাই যে তারক-ব্রহ্ম হরিনাম দ্বারা জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আজও

সেই পতিতপাবন গৌর নিতাইর মধুর হরিনামের ধ্বনিতে ভক্ত হৃদয় অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত হইতেছে। আজও তত্ত্বগণ মহানন্দে গৌর নিতাইর মহিমা কীর্তন করিতেছেন।

সংকার্যের অনুষ্ঠান করিলে মনে যে প্রকার আনন্দ-প্রসাদ জন্মে, পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই প্রকার আনন্দরূপ উপস্থিত হইয়া থাকে। আজ জগাই মাধাইর পূর্বরূপ হৃদ্যবোধ কথায় ব্যক্তিপথে আকৃষ্ট হওয়াতে যৌৱতর আনন্দরূপ উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে পাপের ভীষণ চিত্র সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বেন শিহরিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রভুর অনুগ্রহে জগাই কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছে বটে : কিন্তু মাধাইর হৃদয় ভীষণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্বরূপ মহাপাপের ভীষণ নরকাগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল, সে হৃদয় দগ্ধকারী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

মাধাই জীবনে অনেক হৃদ্যার্থ্য করিয়াছে, অনেক বীভৎস কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই, আজ হঠাৎ তাহার কঠিন হৃদয় একরূপভাবে কাঁপিয়া উঠিল কেন? ইহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। বস্তৃতঃ একরূপ কোমল কাঠিন্ত্যের একত্র সমাবেশ, একরূপ বিশ্বজনীন প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার কোনদিনের তরেও তো তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, তাই গৌর নিতাইর ঐশী শক্তি ও অলৌকিক প্রেমের কথা চিন্তা করিয়া মাধাই একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তাহার বিদেহ অনুতাপে পরিণত হইল, তখন “দয়াল নিতাইকে মারিয়া আমি কি অত্যাচার্য্যই করিয়াছি” এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে প্রাভাতিক সঙ্গীত গান করিয়া উষানার্ভী জ্ঞাপন করিল। সকলেই নিজ নিজ কার্যে রত

হইল ; কিন্তু জগাই মাধাই সুস্থির হইল না । তাহাদের হৃদয় ঘোর-
তর অশান্তিতে পূর্ণ, কিরূপ ভাবে এই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে,
তাহারা এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভুর আলয়াভিমুখে ধাবিত
হইল । এবং মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া “ঠাকুর” “ঠাকুর” বলিয়া ডাকিতে
লাগিল । জগাই মাধাইকে প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত
হইতে দেখিয়া নদীয়ার লোক চমকিত হইল ।

“কাতর হইয়া দৌহে ধায় উর্দ্ধমুখে ;

চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে ।

মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈলা উপনীত ;

ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত ॥”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

মহাপ্রভু, জগাই মাধাইর ডাকে উঠিলেন । এবং তাহাদিগের
দুই ভাইকে আনয়ন করিবার জন্ত মুরারিকে আদেশ করিলেন
মুরারির দেহে শ্রীহনুমান্ প্রকাশ পাইতেন, মুরারি হনুমান্ ভাবে
আবিষ্ট হইয়া একাই বলদৰ্পে জগাই মাধাই দুই ভাইকে মহাপ্রভুর
নিকট আনয়ন করিলেন ।

ইতঃপূর্বে জগাই মাধাই শ্রীগৌরান্দের সংহারমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে ;
কিন্তু এখন মহাপ্রভুর করুণাপূর্ণ ভুবনমোহনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কতকটা
আশস্ত হইল । মনে করিল প্রভু তাহাদিগকে অন্তর্গৃহীত করিবেন ।
এই ভাবিয়া দুই ভাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মহাপ্রভুর চরণতলে পতিত
হইলেন । তাহাদের অশ্রধারা ভূমিতল সিক্ত করিয়া মহাপ্রভুর পাদ
পদ্ম ধৌত করিল । অমনি তাহারা “প্রভো ! রক্ষা কর” বলিয়া
করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ।

“প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি আত্ননাদে ।

চরণে পড়িয়া তারা দুই ভাই কান্দে ॥”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

তখন প্রভু বলিলেন “কেন কি জন্ত তোমরা এখানে আসিয়াছ ? তোমরা না নদীয়ার রাজা ? তোমরা যে বলদর্পে, ঐশ্বর্য্য গর্বে অন্ধ হইয়া জীবগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছ, আজ সেই সমুদয় ভুলিয়া গিয়া ধূলায় নুষ্ঠিত হইয়া কাদিতেছ কেন ? আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিব না ।”

“নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুজন ।

রাজা হ’য়ে কি কারণে কান্দহ এখন ॥”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

এই কথা শুনিয়া তাহাদের অনুতাপানল দ্বিগুণ ভাবে জলিয় উঠিল । তাহারা অমনি বাষ্পাকুল লোচনে গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল “প্রভু, আমরা মহাপাপী, আমাদের জীবনে ধিক্, আমাদের রাজত্বে ধিক্ ; আমরা না করিয়াছি এমন পাপ নাই, গুরুহত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা প্রভৃতি সকল প্রকার পাপ কার্য্যই আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । আপনি পতিতপাবন, পাপীকে উদ্ধার করাই আপনার কার্য্য ; আজ আমাদের দুই ভাইকে উদ্ধার করিয়া আপনার পতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন ।”

জগাই মাধাইর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন । পাপের প্রায়শ্চিত্তের দুইটি প্রধান উপায় । একটা আত্ম-গ্নানি ও অপরটা ভগবনাম কীর্ত্তন । এ ক্ষেত্রে জগাই মাধাইর ঘোর-

তর আশ্রয়ানি উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই ইহাদের প্রতি প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন । জগাই ইতঃপূর্বেই মহাপ্রভুর অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া আশ্রয় হইয়াছে, কিন্তু মাধাই আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে না । ভীষণ অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, যাতনার বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল । মর্শ্বাস্ত্র দ্বারা জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, অবশেষে অধীর হইয়া ত্রীগোরাঙ্গের পাদপদ্ম ধারণ পূর্বক অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিল “প্রভু ! আমরা দুইজনেই পাপকর্ম্য করিয়াছি, কিন্তু একজনকে অনুগ্রহ করিয়া অপরকে নিগৃহীত করেন কেন ?

“দুইজনে এক ঠাঞি কৈনু প্রভু পাপ ;

অনুগ্রহ কেন প্রভু হয় দুই ভাগ ?”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন প্রভু বলিলেন “জগাই আমার নিকট অপরাধী বটে ; কিন্তু তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী । আমি শত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু ভক্তদ্রোহীকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না । ভক্ত-দ্রোহীকে বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করাই একান্ত কর্তব্য । মাধাই ! তুমি নিত্যানন্দের সোণার অঙ্গে রক্তপাত করিয়া পাপের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছ, কাজেই আমি তোমার পরিত্রাণ দেখিতেছি না, আমি হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না ।”

“প্রভু বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি ;

নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্ত পারিলি সে তুঞি ।”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন মাধাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কহিল “প্রভু! আমি মহাপাপী বটে; কিন্তু এখন তোমার নিকট করুণা প্রার্থনা করিতেছি। ক্ষমা করাই তো তোমার কার্য্য, তুমি না অধম তারণ? তবে এ জীবাবধমকে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? তুমি যখন জগৎ-পিতা, তখন তোমার এই হতভাগ্য পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? পিতার সকল পুত্রই কি গুণবান হয়? প্রভু! তুমি পরম কারুণিক আর আমাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিও না, আমার যথেষ্ট হইয়াছে। যদিও আমি মহাপাপী, তথাপি আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। তুমি আমাকে উদ্ধার হইবার উপায় বলিয়া দাও।” মাধাইর করুণ আর্তি শ্রবণ করিয়া আর কি প্রভু স্থির থাকিতে পারেন? প্রভুর কোমল হৃদয় গলিয়া গেল, করুণ আঁধি ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে হৃদয়ের ভাব যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া বলিলেন “মাধাই! তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। তিনি তোমাকে ক্ষমা না করিলে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। তুমি তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।”

এই কথা শুনিবা মাত্র মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের যুগল চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীগোরাঙ্গ বলিলেন “শ্রীপাদ! মাধাই নিজকৃত কার্য্যের জগৎ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে, অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা করাই মহত্বের পরিচায়ক, অতএব তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর। নিতাইর করুণ হৃদয় পূর্বেই দ্রবীভূত হইয়াছে, এখন শ্রীগোরাঙ্গের কথা শুনিয়া বলিলেন “প্রভু! আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, তুমি আমার নিকট আর লুকোচুরী খেলিও না। তুমি লীলাচ্ছলে আমা দ্বারা এই দুই পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। শুধু আমার মান

বাড়াইবার জন্ত তুমি এই সমুদয় কার্য্য করিতেছ ; আচ্ছা তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক । আমি মাধাইকে ক্ষমা করিলাম । এমন কি আমি ইহাও বলিতেছি যে যদি আমি কোন জন্মে কোন প্রকার সংকল্প করিয়া থাকি, তৎসমুদয়ই মাধাইকে দিলাম । তুমি মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাধাইকে শ্রীচরণে স্থান দাও ।”

“নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি ।

বৃক্ষদ্বারে কৃপকর সেই শক্তি তুঞি ॥

কোন জন্মে থাকে যদি আমার স্মৃতি ।

সব দিব মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥

মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই ।

মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই বলিয়া নিত্যানন্দ পরমানন্দে মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন । মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র অমনি ছিন্ন মূল পাদপের ঞ্চায় মূচ্ছিত হইয়া পড়িল ।

চতুর্দিকে গৌর নিতাইর বিজয় ছন্দুভি গগনভেদী স্বরে বাজিয়া উঠিল । ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে হরিক্ষনি করিতে লাগিল । অনেক পাষণ্দদয় গলিয়া গেল, সমাগত দর্শক মণ্ডলী সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল । যে মাধাই নদীয়ার রাজা, যাহার নামে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শঙ্কিত, আজ শ্রীমদ্বিত্যানন্দের প্রেম-বজ্রার প্রবল প্রবাহে সেই মাধাইর বাহুবল, ধনগর্ভ, অনুচিত প্রভুত্ব, বৃথা উদ্ধত্য সমুদয়ই ক্ষণে তুণের ঞ্চায় ভাসিয়া গেল । গৌর নিতাইর জয় জয়ধ্বনি দিগ্ভাঙল ধরিত করিয়া অনন্ত পথে বিলীন হইল ।

তখন শ্রীগোবিন্দ নিত্যানন্দকে বলিলেন, “শ্রীপাদ ! তুমি এই দুই-জনকে জাহ্নবী তীরে লইয়া গিয়া ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দাও ।” এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণসহ কীর্তন করিতে করিতে জগাই মাধাইকে লইয়া জাহ্নবী তীরে উপস্থিত হইলেন । মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল । নদীয়ার লোক নকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাকুলভাবে শ্রোতের ন্যায় জাহ্নবী তীরভিমুখে গমন করিল । সকলেই দেখিল যে যাহারা মুহূর্ত্ত পূর্বে নদীয়ার রাজা ছিল, যাহাদিগের নাম শুনিয়া সকলেই ভীত হইত, আজ সেই নদীয়ার প্রবল পরাক্রমশালী ভীষণ অত্যাচারী দস্যু ভ্রাতৃযুগল গৌর নিতাই দুই ভাইর নিকট ধূলায় লুপ্তিত । সকলেই বিস্মিত হইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল । তখন নিত্যানন্দ দুই ভাইকে বলিতে লাগিলেন,—

“আয়রে জাহ্নবী তীরে দুটা ভাই ।

আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই ॥

মাধাই, মারলি মারলি করলি ভালরে,

এখন হরি ব’লে নেচে আয় ।

তুই মেরেছিস্ কলসীর খণ্ড,

আজ, হরিনাম দিয়া করিব দণ্ড ॥”

জগাই মাধাই তখন অজ্ঞান হইয়া আছেন, গঙ্গার মধ্যে যাইবার শক্তি নাই । ভক্তগণ হৃষ্টচিত্তে দুই ভাইকে স্বন্ধে করিয়া জাহ্নবী জলে লইয়া গেলেন । পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র বারি স্পর্শমাত্র জগাই মাধাইর চৈতন্য হইল । প্রভু, ভক্তগণ ও জগাই মাধাই সকলেই গদাগ্নান করিলেন । জাহ্নবী বক্ষে ভক্তগণ বেষ্টিত শ্রীগোবিন্দ তখন

জগাই মাধাইর হাতে তামা, তুলসী দিয়া গঙ্গীরস্বরে বলিলেন “হে মাধাই ! হে জগাই ! তোমরা এ পর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছ, তাহা আজ তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া আমাকে উৎসর্গ করিয়া দাও ।”

“তোর পাপ পরিগ্রহ করিবত আমি ;

আপন আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি ।”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

এই কথা বলিয়াই শ্রীগোরাঙ্গ হাত পাতিলেন । তখন জগাই মাধাই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অবনত বদনে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল । মুখে বাক্য নাই, নয়নে ধারার বিরাম নাই, তাহারা আজ এই নূতন আদেশ শ্রবণ করিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গড়িল । তখন তাহারা প্রভুরদিকে তাকাইয়া বলিল “হায় ! আমরা কি দুর্ভাগ্য, কি মহাপাপী ! আমাদের তুল্য জীবধম আর পৃথিবীতে নাই, আমাদের দ্বারা শুধু পাপের স্রোতই বৃদ্ধি হইয়াছে, কত যোগী ঋষি এমন কি দেবগণ পর্য্যন্ত যে শ্রীকর কমলে সচন্দন তুলসী পুষ্প ভক্তি ভরে প্রদান করিয়া থাকেন, আজ আমরা সেই শ্রীকরে পাপ দান করিব ? না না, এমন কার্য্য আমরা কিছুতেই করিব না । প্রভু, জগাই মাধাই মহাপাপী বটে ; কিন্তু তাহাদের দ্বারা আর এই কার্য্য হইবে না । পাপ করিয়াছি, অবনত মস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিব । প্রভু, এখন আমাদের এই আশীর্বাদ কর যেন আর তোমার ঐ অভয় চরণ আমাদের বিস্মৃত না হই । আমাদের পাপরাশি অর্পণ করিয়া তোমার শ্রীকর কমল কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিব না ।”

নিত্যানন্দ এই কথা শুনিয়া বলিলেন “মাধাই ! তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন ? শ্রীগোরাঙ্গ পতিতপাবন, আজ তোমাদের দুই

ভাইকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পতিতপাবন নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবেন । জগৎ তাঁহার এই করুণার অপূর্বছবি দর্শন করিবে, তোমাদের দ্বারা ভগবানের যশঃ-সৌরভ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে, তোমরাই আজ পাতকী তারণ নামের প্রধান সাক্ষী হইবে, মাধাই ! এমন কার্য্যে আর বাধা দিও না ।”

শ্রীগৌরান্ধ পুনরায় গভীরস্বরে তাহাদের নিকট পাপ ভিক্ষা চাহিলেন । বলিলেন “জগাই মাধাই ! তোদের সমস্ত পাপ আমাকে দিয়া তোরা পবিত্র হ ।” নিত্যানন্দের উত্তেজনায ও মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় জগাই মাধাই প্রভুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল । তখন নিত্যানন্দ দানমন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন । জগাই মাধাই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রভুর শ্রীকরকমলে তুলসীপত্রসহ পাপরাশি উৎসর্গ করিয়া দিল । জগাই মাধাই নব-জীবন লাভ করিল । তাহাদের পশুত্ব দূর হইল । তখন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দেখিলেন যে শ্রীগৌরান্ধের সোণার বর্ণ অমনি কালিমা প্রাপ্ত হইল ।

“দুইজনার শরীরে পাতক নাহি আর,
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার ।”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন শ্রীগৌরান্ধ বলিলেন ;—

“প্রভু বলে তোরা আর না করিস্ পাপ ;
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া সমাগত দর্শক মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে হরিশ্বনি করিতে লাগিল । গৌর নিতাইর বিজয় ছন্দুভি গগনভেদী

স্বরে দিগ্ভাঙল প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিয়া উঠিল । ভক্তগণ জগাই মাধাই দুই ভাইকে লইয়া প্রভুর বাড়ীতে গমন করিলেন । আসিয়াই আবার সকলে সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন । এই কীর্ত্তনের প্রধান নায়ক জগাই মাধাই হইলেন ।

জগাই মাধাই শ্রীনাম সংকীৰ্ত্তনে উন্মত্ত প্রায় হইয়া প্রভুর আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে জগাই মাধাইর মধুর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন ।

“একি ঠাকুরাল এ যে মাধাই নাচে । ধ্রু

জগাই নাচিলে নাচিতে পারে

আবার মাধাই নাচে ।

নাচে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে ॥”

(চৈতন্য মঙ্গল ।)

শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সমাগত দর্শক মণ্ডলী সকলেই জগাই মাধাইর এই প্রকার নবজীবন ও ভগবৎ প্রেম দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

“এ দুইরে পাপী হেন না করিও মনে ;

এ দুইর পাপ মুঞি লইনু আপনে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত :)

মহাপ্রভুর এইরূপ বাক্যে জগাই মাধাই নিষ্পাপ পুণ্যদ্বার মধো পরিগণিত হইলেন, তখন হইতে তাঁহারা সর্বসাধারণের ভক্তির পথে হইলেন ।

জগাই মাধাইর নবজীবনে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে বটে ; কিন্তু অনুতাপের তীব্র জ্বালা এখনও একবারে মন্দীভূত হয় নাই, তাই কীর্ত্তনানন্দ অধিক কাল স্থায়ী হইল না । তাঁহারা পুনরায় পূৰ্ব্ব-কৃত পাপরাশি স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন ।

“গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন ।

স্মড়রি স্মড়রি পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তাঁহারা ওই ভাই আর বাড়ীতে না যাইয়া ভক্তগণের বাড়ীতেই থাকিলেন । দৈনিক দুইলক্ষ হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন । আহাৰ নিদ্রা সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের অনুতাপানল নির্বাপিত হইল না । মাধাইর আরও বেশী ; “ভগ-বানের শ্রীঅঙ্গে আমি রক্তপাত করিয়াছি” এই কথা যখন স্মরণ হয় তখনই মাধাই যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকেন ।

নিত্যানন্দ তাঁহাদের দুর্দশা দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, কত রকম বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রবোধ মানেন না । একদিন মাধাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণ নুগল ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন “প্রভু, তোমার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছি, আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হইবে না, আমার মঙ্গল কিছুতেই হইবে না ।”

“যে অঙ্গ লজিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়,

যে অঙ্গ লজিয়া দ্বিবিদের নাশ হয় ;

যে অঙ্গ লজিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ ;

আরো মোর কুশল ! লজিনু হেন অঙ্গ ?”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

মাধাইর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন “মাধাই ! তুমি মনে কিছুমাত্র দুঃখ করিও না। তুমি আমার পুত্র তুল্য ; শিশু পুত্রের করাঘাতে যেমন পিতা দুঃখ না পাইয়া বরং স্নেহ বোধ করেন, তোমার প্রহারেও আমি সেইরূপ ব্যথিত না হইয়া বরং স্নেহ বোধ করিয়াছি, তুমি আর এ জ্ঞা রূথা আক্ষেপ করিও না।”

“শিশু পুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায় ?

এইমত তোমার প্রহার গোর গায়।”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

শ্রীনিত্যানন্দের এইরূপ সাঙ্গনা বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধাই বলিলেন “প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে বটে ; কিন্তু আমি যে জীবনে কত পাপ করিয়াছি তাহার সীমা নাই, কত সাধুজনের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছি, কত পতিব্রতা রমণীর সতীত্বরত্ন হরণ করিয়াছি, কতজনের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া পথের কাঙ্গাল করিয়াছি। প্রভু, আমার কি এই সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে ? পূর্বকৃত পাপরাশি যেন আমার মানসপটে ক্রমেই নবীভাব ধারণ করিতেছে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয় যে আমি তাহাদের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ; কিন্তু আমি সকলকে চিনি না, মাতাল হইয়া কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছি তাহা মনে নাই ; কাজেই আমার সে সঙ্কল্প সাধন করিবার উপায় দেখিতেছি না।”

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন “যদি সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাকে একটা উপায় বলিতেছি, তুমি তদনুসারে কাজ কর, তবেই তোমার অভিষ্ট

সিদ্ধ হইবে। প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যে সকল লোক স্নান করিতে আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট অজ্ঞাত পাপের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।”

সেইদিন হইতে মাধাই নিজে কোদালি ধারণ করতঃ গঙ্গাতীরে একটা ঘাট প্রস্তুত করিলেন এবং একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র পরিধান পূর্বক নদীয়ার ঘাটে যাইয়া হরিনামের মালা জপ করিতে লাগিলেন। যে কেহ গঙ্গাস্নান করিতে ঘাটে আসিতে লাগিল, মাধাই অমনি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইয়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রুতাজলিপুটে প্রণতি পূর্বক কাতরস্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন। “আমি জানিয়া কি না জানিয়া যদি কখনও আপনাকে কোন হুঃখ দিয়া থাকি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।”

নদীয়ার রাজার এইরূপ অপূর্ব পরিবর্তন ও অলৌকিক দীনতা দর্শনে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অনেকের চক্ষেই অশ্রু দেখা দিল, অনেক পাষণ্ড গৌর নিতাইর এই অপূর্ব ঐশী শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভাবে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, অনেক পাপী মাধাইর দৃষ্টান্তের অনুগামী হইল। সেইদিন হইতে মাধাই পরম ব্রহ্মচারী বলিয়া খ্যাত হইলেন; আর এই ঘাট “মাধাইর ঘাট” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল।



ষোড়শ অধ্যায় ।

১১ — * — ১২

সংকীৰ্তনে গৌর নিতাই ।

“চেতো দৰ্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নিকৰাপণং ।

শ্রেয়ঃ ! কৌৰবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধু জীবনং

আনন্দানুধিবৰ্দ্ধনং প্রতিপদং পূৰ্ণায়তাসাদনং

সৰ্ববাস্থস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণং সংকীৰ্তনং ॥”

(শ্রীমদ্ভাগবত ।)

যদ্বারা মানবের চিত্তরূপ দৰ্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহা দাবাগ্নি নিকৰাপিত হয়, জীবের শ্রেয়োরূপ শুভোৎপলের ভাব চন্দ্রিকা বিতরিত হয়, যাহা ব্রহ্মবিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ হয়, যাহা বিমলানন্দ সমুদকে উদ্বেলিত করে ; যাহার প্রতিপদে অমৃতের আশ্বাদন পূর্ণ-মাত্রায় আছে, যাহা সৰ্ব্বাত্মাকে রসভাবে স্নান করাইয়া অপূৰ্ব তৃপ্তি প্রদান করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীৰ্তন জয়যুক্ত হউক ।

মহা ঝটিকা প্রবাহিত হইবার পর যেমন উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কল-সমুদ্র শান্তভাবে ধারণ করে, জগাই মাধাই দম্ভ্য-ভ্রাতৃযুগলের উদ্ধার বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র নদীয়া নগরীও সেই প্রকার শান্তমূর্তি ধারণ করিল। দলে'দলে লোক আসিয়া তাঁহার ভক্ত হইতে লাগিল। অতঃপর শ্রীগৌরান্দের করুণ হৃদয়ে নূতন ঙ্গাবের উদয় হইল। তিনি কলির জীবের দুর্বস্থা ও ধর্ম জগতের অবনতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। “জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম পাপ বীজ বিনাশের একমাত্র মহৌষধ।” ঔষধ প্রয়োগের এই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অগ্নায়ুঃ—হীনবীৰ্য্য—ভগ্নস্বাস্থ্য—ধর্ম জ্ঞানশূন্য কলির জীবের পক্ষে অত্র কোনও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে, ইহাই বিবেচনা করিয়া ভব-রোগের একমাত্র মহৌষধ স্বরূপ মধুর হরিনাম দ্বারা তাহাদিগকে উদ্ধার করার নিমিত্ত দুইটি উপায় নির্ধারণ করিলেন।

(১) “বহিরঙ্গ ভাবে হরেকৃষ্ণ রাম নাম।

প্রচারিলা জগমাঝে গৌর গুণধাম ॥”

(২) “অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।

রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে ॥”

নাম কীর্তনই কলির ধর্ম। এ সম্বন্ধে অত্যান্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যথা ;—

“সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতেমথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্তনাং ॥”

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ।)

“ধ্যায়নকৃতে যজন্ যজ্ঞে ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীৰ্ত্য কেশবম্ ॥”

(বিষ্ণুপুরাণ ।)

সত্যে ধ্যান দ্বারা ত্রেতায যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে অর্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম কীর্তন দ্বারা সেই ফল হয় ।

এই নিমিত্ত শ্রীগোরাঙ্গ কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন । শ্রীমদ্বিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহযোগী হইলেন । যে জগাই মাধাই হরিনামের ধ্বনি শুনিবা মাত্র উন্নতবৎ ক্ষেপিয়া উঠিত, আজ শ্রীগোরাঙ্গের অন্তর্গত তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আজ তাঁহারা দুই ভাই কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন । পাপক্লিষ্ট কলির জীব সর্বদাই ভোগ সুখে রত, কিছুতেই তাহাদের পাপাশক্তির নিবৃত্তি হয় না, বিশেষতঃ প্রেমভক্তি শূন্য হৃদয়ে সদুপদেশও উষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়, এই জন্ত তিনি চিন্তা করিলেন যে যাহার যে বিষয়ে রুচি তাহাকে সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া চালাইলে সহজেই ধর্মপথে নেওয়া যাইতে পারিবে । মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া অবশেষে শ্রীগোরাঙ্গ নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করিলেন ।

“মাগুর মাছের কোল, যুবতী মেয়ের কোল,
বোল হরিনোল ।”

প্রথম দুইটির প্রলোভনে অনেকেই হরিনাম বলিতে যাইত, কিন্তু শেষে নামের গুণে তাহাদের সেই পশুভাব দূরে যাইয়া দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ হইত ।

“নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়” ।

“সর্বত্র সর্বকালেষু যেহপি কুর্বন্তি পাতকং ।

নাম সংকীৰ্ত্তনং কৃতা যাস্তি বিষেণাঃ পরং পদং ॥”

তখন তাহারা নামামৃতের আনন্দ পাইয়া বুঝিতে পারিত যে মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয় কেবল হরিনামে যে প্রেমাত্ম পড়ে, আর যুবতী মেয়ে কিনা পৃথিবী, যুবতী মেয়ের কোল আর কিছুই নয় হরিপ্রেমে ধুলায় গড়াগড়ি ।

বস্তুতঃ গৌর নিতাইর এই নূতন ব্যবস্থায় অনেক পাষণ্ড হৃদয় গলিয়া গেল, অনেক কঠিন হৃদয় সরস হইল, দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত হইতে লাগিল । শ্রীধাম নবদ্বীপ তখন হইতে সংকীৰ্ত্তনের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিল । নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কীৰ্ত্তনানন্দে বিভোর হইল । শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য নূতন ভাবে কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হইল না, সহসা একটা নূতন ভাবের উদয় হইল । একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ কীৰ্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন “আজ কীৰ্ত্তনে আমার আনন্দ বোধ হইতেছে না কেন ? আজ আমি নৃত্য করিতে পারিতেছি না কেন ? আমি কি কোন ভক্তের নিকট অপরাধ করিয়াছি ? যদি অজ্ঞাতসারে কাহারও নিকট কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তোমরা তাহা ক্ষমা করিয়া আমাকে প্রেম দান কর ।” এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষাদ ভরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং সেদিনকার মত কীৰ্ত্তন বন্ধ হইল ।

আর একদিন রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীৰ্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে আনন্দানুভব করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ।

“আজ কীৰ্ত্তনে মন লাগিতেছে না কেন ? আজ আমি আনন্দভরে নাচিতে পারিতেছি না কেন ? আজ কি কোন অভ্যন্তর সহিত আপা করিয়াছি ? না কোনরূপ ~ নামাপরাধ করিয়াছি ? ভক্তগণ ! যদি তোমাদের কাহারও নিকট অজ্ঞানভাবে কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিয়া আমাকে প্রেম দাও ।”

শ্রীগোরাঙ্গের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত দঃখিত হইলেন ; কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । তখন শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতের পানে একাইয়া বলিলেন, “গোসাই ! তুমি প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেমলাভ করিয়া পরমানন্দে নাচিতেছেন, আপা-মর সাধারণ সকলেই তোমার প্রেম ভোগ করিতেছে, সুধু আমি আর শ্রীপাদ তোমার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলাম ? গোসাই ! আমাকে অনুগ্রহ পূৰ্বক প্রেম দান কর, নতুবা আমার জীবন যায় ।” শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার কথা না শুনিয়া আরও দ্বিগুণ উৎসাহে নাচিতে লাগিলেন । তখন শ্রীগোরাঙ্গ বলিলেন “গোসাই ! যদি তুমি আমাকে প্রেম না দাও, তবে তোমার সমুদয় প্রেম আমি গুণিয়া লইব ।” শ্রীঅদ্বৈতের

“নামাপরাধযুক্তানাং নামাশ্চেব হরস্তাৎ ।

অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তাশ্চেবার্থ্য করানি চ ॥”

নামাপরাধ পরিশূন্য হইলেই জীবের নামে ঋচি, নিষ্ঠা ও রতি জন্মে । অতঃপর নাম গ্রহণের অধিকারী হইবার জন্য সাধককে প্রস্তুত হইতে হয় ।

নামাপরাধ দশ প্রকার ।

(১) সাধু নিন্দা, (২) বিষ্ণু নাম হইতে পৃথক্ ভাবে শিব নামাদি কীৰ্ত্তন, (৩) গুরু অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদান্তগত শাস্ত্র নিন্দা, (৫) নাম মাহাত্ম্যে অবিধান, (৬) প্রকারান্তরে নামের অর্থ করা, (৭) অশ্রু শুভকর্ম (যজ্ঞ ব্রতাদি) সহ নামের তুল্যতা বিচিন্তন, (৮) নাম বলে পাপ করা, (৯) অন্ধাবিহীনকে নামোপদেশ দান, (১০) নাম মাহাত্ম্যে অপ্রীতি ।

সহিত শ্রীগোরাঙ্গের কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রায়ই তিনি বলিতেন “আমি বিশ্বস্তরের প্রেম শুষিয়া লইব দেখি সে কেমন করিয়া নাচে ?” আজ শ্রীগোরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সেই কথা পুনরায় শুনাইতেছেন দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু, মহাপ্রভুকে কিছু কৰ্কশ বাক্য শুনাইলেন, কিন্তু কি বলিলেন তাহা ভালরূপ জানা যায় না। তবে এইটুকু মাত্র আভাস পাওয়া যায় ;—

“চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গৌসারিঞ ।

কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

অদ্বৈত প্রভুর কৰ্কশ বাক্য শ্রীগোরাঙ্গের অসহ হইল, তিনি আর কোন উত্তর না করিয়া সদর দ্বার খুলিয়া বিদ্বাহেগে জাহ্নবী মুখে ছুটিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শ্রীগোরাঙ্গ দৌড়িয়া যাইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দ্রুতবেগে যাইয়া জাহ্নবী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুইজনে প্রভুকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ নিত্যানন্দের করকমলে শ্রীগোরাঙ্গের মস্তক স্পর্শ করিল, অমনি তিনি ডুব দিয়া শ্রীগোরাঙ্গকে ধরিয়া তীরে উঠাইলেন। তখন শ্রীগোরাঙ্গ বলিলেন, “তোমরা আমাকে উঠাইলে কেন ? আমার জীবন থাকা না থাকা সমান ।”

“প্রেম শূন্য শরীর থুইয়া কিবা ফল ?”

প্রভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের নয়ন যুগল হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিতাইর কাতর ভাব দর্শন

করিয়া প্রভু অধোবদন হইলেন। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন “প্রভু, সেবক যদি অভিমান করে ২৪টা কর্কশ বাক্য বলে, তুমি তাই বলিয়া কি তাহার প্রাণ বধ করিবে?”

“অভিমাণে সেবকেরা বলিলে বচন।

প্রভু তা লইবে কি ভূত্যের জীবন?”

(চৈতন্য ভাগবত।)

প্রভু, তুমি এরূপ না করিয়া আচার্য্যের প্রতি অশ্রুদণ্ডের বিধান কর।” তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবনত বদনে বলিলেন “তোমাং গৃহে গমন কর। আমি অশ্রুকার মত নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি।” নিত্যানন্দ ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গকে নন্দন আচার্য্যের আলয়ে রাখিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। নন্দন আচার্য্য পরমানন্দে প্রভুর পরিচর্যা করিলেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে হারাইয়া মর্শ্বস্তদ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন, আহা! নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তত্ত্বগণ সকলেই বিষন্ন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কেহই তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহসী হইতেছেন না। প্রাতঃকালে প্রভু শ্রীবাসকে আনিবার জন্ত নন্দন আচার্য্যকে আদেশ করিলেন। নন্দন আচার্য্য শ্রীবাসকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীবাস কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন “পণ্ডিত, শাস্ত্র হও। আচার্য্যের অবস্থা কি প্রকার বল?” শ্রীবাস বলিলেন “প্রভু, আচার্য্যের সংবাদ আর কি বলিব? আপনি যাওয়ার পর হইতে তাঁহার প্রাণ

বাওয়ার উপক্রম হইয়াছে । তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শয্যায় শায়িত আছেন । প্রভু, তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে, গোঁসাইকে আর কষ্ট দিবেন না, এখন একটী অভয়বাণী বলিয়া আচার্য্যের প্রাণ রক্ষা করুন ।” তখন শ্রীগৌরান্ধ বলিলেন “পণ্ডিত, চল আচার্য্যের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি ।” এই কথা বলিয়া তাঁহার। দুইজনে শ্রীঅদ্বৈতের আলয়াভিমুখে গমন করিলেন । যাইয়া দেখেন আচার্য্য জীবন্মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন । শ্রীগৌরান্ধ আচার্য্যকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু আচার্য্য লজ্জা ও মনঃকষ্টে কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল অধোবদনে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । প্রভু পুনরায় ডাকিলেন আচার্য্য ! উঠ । তখন আচার্য্য ধীরে ধীরে বলিলেন, “প্রভু, আমার মত হতভাগ্য আর নাই, আমার জীবন থাকা না থাকা সমান । আমি এতদিন পরে বুঝিলাম যে তুমি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস না । যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ ভাবে ভালবাস তাহাদিগকে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দীনতা প্রভৃতি ভক্তি উদ্দীপক বৃত্তি গুলি দিয়াছ, আর আমাকে বহিরঙ্গ মনে কর বলিয়া বৃথা অহঙ্কার, মিথ্যা অভিমানও অকিঞ্চিৎকর ঔদ্ধত্য খানিক দিয়াছ । তোমার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তোমার শ্রীচরণ পাইয়া বিমল শান্তি উপভোগ করে, আর আমি বহিরঙ্গ বলিয়া বৃথা অহঙ্কারের অবশুস্তাবী ফল স্বরূপ অনুক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকি । প্রভু, তুমি আমাকে ভক্তি কর বলিয়া দীনতার পরিবর্তে ক্রমেই অহঙ্কারে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে, আমি তোমার ঐক্লপ মৌখিক ভালবাসা আর চাই না । এখন হইতে আমাকে এই আশীর্বাদ কর যেন আমি দীনভাবে তোমার ঐ অভয় পদের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি ।”

“হেন কর প্রভু মোরে দাস্ত্যভাব দিয়া ।

চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন প্রভু ভগবত্তাবে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “আচার্য্য, তুমি বহিঃপ্রস্থ হইলে তোমাকে ঐরূপ দণ্ড করিতাম না । আপন জনকেই আমি ঐরূপ দণ্ড করিয়া থাকি ।”

“অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে ।

জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ মহোল্লাসে হরিশ্রবণ করিতে লাগিলেন, পুনরায় পূর্ববৎ সুখের হিলোল বহিতে লাগিল । ইহার পরে একদিন শ্রীগোরাঙ্গ ভক্তগণকে বলিলেন, “চল আমরা সকলে মিলিয়া একদিন কৃষ্ণলীলার অভিনয় করি ।” এই প্রস্তাবে সকলেই স্বীকৃত হইলেন । প্রভু, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্নের বাড়ীতে অভিনয়ের স্থান নির্দেশ করিলেন । শ্রীগোরাঙ্গ নিজেই অভিনেতৃগণের মধ্যে কে কি সাজিবেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিলেন, “আমি রাধা, শ্রীবাস নারদ, গদাধর ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল ও আচার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইবেন ।” ইহার পরে নির্দিষ্ট দিনে আচার্য্য রত্নের বাড়ীতে অভিনয় আরম্ভ হইল । শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাসের পত্নী মালিনীদেবী ইঁহারা সকলেই অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই ছিল যে যিনি যাহা সাজিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছিলেন, দর্শকগণ

মধ্যে কেহই তাঁহাদের স্বরূপ অনুভব করিতে পারিলেন না । শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরালে থাকিয়া এই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং রাধা সাজিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইলেন, মনে করিলেন স্বয়ং শ্রীমতীই বুঝি রঙ্গালয়ে আবিভূত হইয়াছেন । শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ি সাজিয়া অনেক অদ্ভুত ভাব দেখাইলেন । ক্রমশঃ সকল অভিনয় শেষ হইল । একে একে সকলেই গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন । ইহার কিছুকাল পরে কি জানি কি কারণে শ্রীঅদ্বৈতের মতের পরিবর্তন ঘটিল । তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল । তিনি ভক্তি-যোগের পরিবর্তে জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাহিরে একবারেই পরিত্যাগ করিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন যে বিশ্বস্তর অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ বটে ; কিন্তু তাঁহাকে ভগবদ্ভাবে অর্চনা করা যায় না । তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন আমি সর্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে জ্ঞান চর্চ্চাই ভগবৎ প্রাপ্তির প্রধান উপায় । সংকীৰ্ত্তনে নৃত্য করিয়া কখনও ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে না ।

“আদি’ অন্ত আমি পড়িলাম সর্বশাস্ত্র ।

বুঝিলাম সর্ব অভিপ্রায় জ্ঞানমাত্র ।”

(চৈতন্য ভাগবত) ।

শ্রীঅদ্বৈতের হঠাৎ একপ ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ কি ? যিনি পরম গৌরাঙ্গ ভক্ত তাঁহার একপ ভাবের পরিবর্তন হইল কেন ? পাঠক ! ইহার কারণ আছে । শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান, তিনি আমাকে বড়ই কষ্ট দেন, কোথায় আমি তাঁহাকে ভক্তি

করিব ? না তাহা না করিয়া তিনিই আমাকে ভক্তি করেন। আমি বৃদ্ধ তাঁহার সহিত বলে পারি না, তিনি বলপূর্বক আমার চরণধূলি গ্রহণ করেন।

“বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।

ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি ॥”

ইহা দূর করিবার কি অণু উপায় নাই ? ইহাই চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তি যোগের প্রবর্তক, আমি সেই ভক্তির বিরোধী হইয়া জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিব, তাহা হইলে আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন হইবে। ক্রোধ হইলেই তিনি আর আমাকে ভক্তি করিবেন না। আমাকে দণ্ড করিবেন। তাঁহার দণ্ড পাইলেই আমি কৃতার্থ হইব। শ্রীঅদ্বৈত এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণকে যোগবাসিষ্ট পড়াইতে লাগিলেন, এবং ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া একদিন নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরে রওনা হইলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মাঝখানে ললিতপুর নামে একটি গ্রাম, এই গ্রামের রাস্তার ধারে একখানা দর দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ ঘর কাহার ?” নিতাই পূর্ব হইতেই নানাস্থানে পর্যটন করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার সমুদয় জানাশুনা ছিল, তিনি বলিলেন “ইহা একটা সন্ন্যাসীর গৃহ।” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন “চল তবে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আসি।” এই বলিয়া প্রভু নিতাইকে লইয়া রওনা হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র নিতাই নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, সন্ন্যাসী—

“ধন হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তখন প্রভু দাঁড়াইয়া কৃতাজলিপুটে বলিলেন, “ঠাকুর, এ কিরূপ আশীর্বাদ করিলেন? এতো আমার প্রার্থনীর আশীর্বাদ নহে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমি কৃষ্ণভক্ত হই।”

সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “এষে দেখ্ছি পাগল, আমি ভাল বুঝিয়া শুভাশীর্বাদ করিলাম, কিন্তু তুমি তাহা মন্দ বুঝিলে?” নিত্যানন্দ বলিলেন “গৌসাক্ষি, ইনি বালক, আপনি ইহার কথা শুনিয়া অযথা ক্রুদ্ধ হইবেন না। বালক সুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ আপনাকে ঐ প্রকার কথা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ আপনার মাহাত্ম্য ইনি বুদ্ধিতে পারেন নাই। অতঃপর পূর্বক আপনি ইহার অপরাধ ক্ষমা করুন।” সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিতাইকে বলিলেন, “যদি সৌভাগ্যক্রমে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে অল্প এখানে অবস্থান করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন।” নিতাই বলিলেন “আমরা শীঘ্রই স্থানান্তরে যাইব, বড় ব্যস্ত আছি। যদি তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহার চেষ্টা করুন।”

সন্ন্যাসী, পরম সুন্দর যুবক অতিষিষ্মের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। তিনি জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। গৌর নিতাই দুই ভাই স্নান করিয়া কিছু ফলাহার করিলেন। জলযোগ শেষ হইলে বামাচারী সন্ন্যাসী নিতাইকে বলিলেন, “কিছু আনন্দ আনিব নাকি?” প্রভু আনন্দ কাকে বলে জানেন না, কাজেই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আনন্দ মানে কি? নিতাই বলিলেন, “বামাচারি সন্ন্যাসিগণ মদকেই আনন্দ বলিয়া থাকেন।” প্রভু মদের কথা শুনিবামাত্র “বিষ্ণু বিষ্ণু” বলিয়া ভৎসনাং সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্যামেগে ছুটিয়া পলাইলেন।

মণ্ডপের গৃহে গমন করিয়া অন্নায় করিয়াছি, ইহাই মনে করিয়াই বোধ হয় শ্রীগোরাঙ্গ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিতাইও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই জাহ্নবীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুইজনে জলকেলি আরম্ভ করিলেন। উভয়েই সন্তরণ পটু, জল হইতে আর তাঁরে উঠিলেন না, সন্তরণ করিতে করিতে দুই ভাই ললিতপুর হইতে শান্তিপুর উপস্থিত হইলেন। শান্তিপুরের পথে প্রভু ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, “নাড়া আবার ভক্তিপথের বিরোধী হইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছে? আজ আমিও তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিব।” নিতাই প্রভুর কথায় উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরেই উভয়ে আচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখেন যে, অদ্বৈত কয়েকজন শিষ্যকে জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

নিমাই ও নিতাই দুইজনে আর্দ্রবস্ত্রে তথায় উপস্থিত, নিমাইর শরীর হইতে কোটা সূর্য্যের তেজঃ যেন বিদ্যুৎবেগে বাহির হইতেছে। প্রভুর দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া সকলেই ভীত হইলেন, হরিদাস প্রভুর চরণতলে দীঘল হইয়া পড়িয়া গেলেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পত্নীও এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়া চিন্তিতা হইলেন, আচার্য্যের পুত্র অচ্যুত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু এ সমুদয় কিছুই লক্ষ্য না করিয়া, আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁরে নাড়া, তুই নাকি ভক্তির বিরোধী হইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছিস?” অদ্বৈত তখন দীরভাবে বলিলেন, “জ্ঞান তো চিরকালই বড়, ভক্তি তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। জ্ঞানশূন্য ভক্তি শুধু একদেশদর্শী অন্ধ-বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, উহা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, উহা দ্বারা আত্মার পুষ্টি কিছুই হয় না।”

প্রভু এই কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া বৃদ্ধ আচার্য্যের চুলে ধরিয়া কিলাইতে লাগিলেন। অদ্বৈতের মনোবাসনা পূর্ণ হইল, তিনি

মহাপ্রভুর শ্রীকর-কমলের কিল খাইয়া মহানন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “ভক্তগণ ! তোমরা দেখ আমার প্রতি প্রভুর কত অনুগ্রহ ! আমি প্রভুকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু প্রভু আমাকে ছাড়িলেন না। প্রভুর প্রহারে আমি বড়ই আনন্দ পাইলাম, আজ আমার শরীরের সমুদয় পাপন্দুর হইল।”

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই উচ্চকণ্ঠে হরিশ্রবণ করিতে লাগিল, ভক্তগণ পূর্ববৎ সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভুর চরণ-তলে পতিত হইলেন। অমনি প্রভু স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, করেন কি ? আমাকে এরূপ কষ্ট দিতেছেন কেন ?” এই কথা বলিয়া পুনরায় অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন। এবং বলিলেন, “ঠাকুর, আমি ত কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করি নাই ? যাহা হউক যদি করিয়া থাকি, তবে আপনার শিশু পুত্র অচ্যুতের ঞ্জায় আমাকে মনে করিয়া নিজগুণে এ অধমের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।”

প্রভুর কথা শুনিয়া অদ্বৈত, হরিদাস ও নিতাই তিনজনই হাসিতে লাগিলেন। অদ্বৈত গৃহিণী সীতা দেবী গৃহে থাকিয়া এই সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তখন প্রভু বলিলেন, “মা কোথায় ? শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত কর, বেলা হইয়াছে, বড় ক্ষুধা পেয়েছে।” অদ্বৈতকে বলিলেন, “গোঁসাই, তবে চলুন স্নানে যাই।” অদ্বৈত গৃহিণী সীতা দেবী তখন পরমানন্দে আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিলেন। প্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস সকলেই স্নান করিয়া আসিলেন। তারপর তিন প্রভু একত্র ভোজন করিতে বসিলেন। অদ্বৈতের সহিত নিতাইর প্রায়ই দ্বন্দ্ব হইত, এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের অন্তথা হইল না। নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়া অদ্বৈতের গায়ে দিলেন। অদ্বৈত প্রভু পরম সাত্ত্বিক লোক, তিনি নিতাইর ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া

পরিধেয় বস্ত্রখানা পরিত্যাগ পূর্বক অস্ত্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিছুকাল উভয়ে গালাগালি হইল, আবার একটু পরেই নিতাই ও অদ্বৈত মহানন্দে পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে অদ্বৈতগৃহে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় দুই ভাইশ্বে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পশ্চিমধ্যে হরিনদী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রভুর শরীরে শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন। তিনি ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিলেন এবং নিজ হাতে বৈঠা বাহিয়া নদী পার হইলেন। নদীর অপর পারেই অম্বিকা কালনা গ্রাম। তথায় পরম সাধু গৌরীদাস পণ্ডিত বাস করেন। ইঁহার পিতার নাম বংশারি মিশ্র, মাতার নাম কমলা দেবী। ইনি ভগবদ্ভক্ত পরম বৈষ্ণব, শালিগ্রামে ইঁহার পূর্ব বাসভবন ছিল, কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করার অভিপ্রায়ে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। প্রভুকে দেখিয়া প্রথমতঃ গৌরীদাস চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া অনিমেষ নয়নে তদীয় মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরান্ন বৈঠাঙ্ককে দণ্ডায়মান, তাঁহার অমানুষিক রূপে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে, গৌরীদাস সতৃষ্ণনয়নে এই মূর্তি দর্শন করিতে করিতে চিত্তোপ্তবৎ নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রাহিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রভু বলিলেন, “আমি শান্তিপু্রে গিয়াছিলাম, তথা হইতে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকায় উঠিয়াছি, এবং এই বৈঠা বাহিয়া নদী পার হইয়াছি। পণ্ডিত, তুমি এই বৈঠা গ্রহণ কর এবং ইহা দ্বারা পাপক্লিষ্ট জীবগণকে ভবনদী পার কর।”

“পণ্ডিতেকে কহে শান্তিপু্রে গিয়াছিনু ।

‘হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু ॥

গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায় ।

এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায় ॥”

(ভক্তি রত্নাকর ।)

প্রভু এই কথা বলিয়া গৌরীদাসের হস্তে বৈঠা প্রদান করিলেন, গৌরীদাস দুই হস্তে ভক্তি সহকারে বৈঠা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “প্রভু, আপনি কে ?” প্রভু বলিলেন, “আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত ।” নিমাই পণ্ডিতের নাম অনেক দিন পূর্ব হইতেই শুনা ছিল বটে ; কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নাই, এইক্ষণ তাঁহার কথা শুনিবামাত্র গৌরীদাস সাষ্টাঙ্গে শ্রীগৌরান্দের চরণতলে পতিত হইলেন । ভক্তপ্রিয় শ্রীগৌরান্ধ্র অমনি গৌরীদাসকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । শ্রীগৌরান্দের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার ত্রিতাপজ্বালা দূর হইল, এবং হৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার হইল । গৌরীদাস, প্রভুদত্ত এই ঐশীশক্তি লাভ করিয়া বাস্তবিকই ভাপিত জীবগণকে ভবনদী পার করিতে লাগিলেন । গৌরীদাস পণ্ডিতের অভাবের পর হইতে তাঁহার শিষ্য হৃদয় চৈতন্ত ও তৎপরে হৃদয় চৈতন্তের শিষ্য শ্রামানন্দ এই বৈঠা প্রাপ্ত হন । শ্রীগৌরান্দের প্রদত্ত এই বৈঠা অজ্ঞাপি কালনায় আছেন । বৈষ্ণবভক্তগণ এখনও এই বৈঠা দর্শন জন্ম কালনায় গৌরীদাস মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন । এইরূপে শ্রীগৌরান্ধ্র গৌরীদাসকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া তথা হইতে পুনরায় নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন ।



সপ্তদশ অধ্যায়



জীবে প্রেম ।

“আত্মোপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ ।”

জীবের প্রতি প্রেম মহাপুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ । যাহা তাঁহাদের নিকট তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা সাধারণকে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের মনতুষ্টি জন্মে না । শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া আসিয়া পুনরায় কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন । যে শ্রীহরি নাম তাঁহার নিকট অমৃতের ত্রায় বোধ হইত, যে নামের গুণে তিনি আত্মবিস্মৃত হইতেন, সেই নামসুধা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জগতের সকল লোককেই বিতরণ করেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা হইল । শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগ জনিত ভগবৎ প্রেম-সুখে মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন । নবদ্বীপে পুনরায় প্রবলবেগে সংকীর্ণনের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল ; কিন্তু সাধুকার্য্যে বিপদ অপরিহার্য্য ও অবশ্যজ্ঞাবী । জগাই

মাধাইর উদ্ধার বার্তা প্রচার হওয়ার পর হইতেই শ্রীগৌরান্দের গৌরব ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যে একজন মহাপুরুষ এবং তাঁহার শক্তি যে ঐশীশক্তিরই প্রতিকল্প এ বিশ্বাস অনেকের হৃদয়েই রুদ্ধমূল হইল। তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। বহুদূরদেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু ধার্মিকগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তহৃদয় প্রফুল্ল হইল বটে ; কিন্তু ঈর্ষাকলুষিত হৃষ্টলোকের ক্রোধের সঞ্চার হইল।

সমাজের মধ্যে একেবারে নগণ্য থাকা একদিকে যেমন কষ্টকর, অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিও অপর দিকে তেমনি অসুবিধা জনক। লোক-সমাজে গৌরব ও প্রতিষ্ঠারুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরান্দেরও এই অসুবিধা বিশেষরূপে ভোগ করিতে হইল। সাধারণ লোক যেমন তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, হৃষ্ট মুসলমান ও ঈর্ষাকলুষিত ধর্মব্যবসায়ী হিন্দুগণ তেমনই তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাজির নিকট যাইয়া নালিশ করিলেন, কাজি প্রথমে এ কথা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান ও হিন্দুগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দৃঢ়তার সহিত বুঝাইতে লাগিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিরোধোৎপাদক। তিনি শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য না করিয়া আপাতঃ মধুর সংকীর্ণনাদি দ্বারা সাধারণ লোককে ধর্মপথ ভ্রষ্ট করিতেছেন। হিন্দুধর্মের মানি জম্মাইয়া কি এক নূতন মত “নাম মাহাত্ম্য” প্রচার ও “ভক্তিব্যাখ্যা” আরম্ভ করিতেছেন, সম্রাস্ত বংশীয় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবমাননা করিতেছেন, সনাতন ধর্ম ও সমাজিকতা রক্ষার জন্য তাহাকে বিশেষ শাসন করা আবশ্যক। চাঁদ কাজি ইহাদের কথায় সংকীর্ণনে বাধা জম্মাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ কীর্তন রহিত করিয়া দিলেন । ভক্তগণও কাজির ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে কীর্তন করিতে ক্ষান্ত হইলেন ।

ইতোমধ্যে এই সংবাদ দাবানল প্রায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল । ভক্তযুগে কাজির অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইলেন । তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “কি কাজি কীর্তন বন্ধ করিয়াছে ? অথ আমি প্রকাশ্যভাবে নগরে নগরে কীর্তন করিয়া প্রেমের বজ্রায় নদীয়া ভাসাইব । দেখিব কাজির বাহতে কত বল ? অদ্য আমি অবশ্যই কাজির গর্ভ ধ্বংস করিব । শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ! তুমি শীঘ্র নগরে যাইয়া ঘোষণা প্রচার কর যে, “অদ্য আমি প্রকাশ্য ভাবে নগর সংকীর্তনে বাহির হইব ; ভক্তগণ যেন প্রত্যেকেই এক একটা দীপ লইয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হন ।”

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রস্তুত হইলেন, নিমাই পণ্ডিতের কীর্তন দেখিবার জল দলে দলে লোক ছুটতে লাগিল । নদীয়া নগরী আজ নব শক্তিতে টলমল করিতে লাগিল । অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিমাইকে মনের সাথে মোহন বেশে সাজাইয়া দিলেন । নিতাই, অশ্বত, হরি-দাস প্রভৃতি পারিষদবর্গ লইয়া নিমাই তখন প্রকাশ্য সংকীর্তনে বাহির হইলেন । ভক্তগণ মধুর কীর্তন গান করিতে লাগিলেন ।

“বল ভাই হরি ও রাম রাম হরি ও রাম ।

এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥”

প্রেমের বজ্রায় নদীয়ার নানা স্থান ভাসাইয়া অবশেষে দলবল সহ নিমাই কাজির আলয়ে উপস্থিত হইলেন । কাজির সৈন্তগণ প্রথমতঃ নিমাইকে সঙ্কীর্তনে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল । শ্রীভগবানের নিকট অন্তর্হিত

ঐচ্ছিকতা ও বৃথা অহঙ্কারের পতন অবশ্যজ্ঞাবী। তাই কাজির সকল গৰ্ব্ব আজ খর্ব হইল। কাজি এতক্ষণ দূরে লুক্কায়িত ছিলেন, পরে প্রভুর আদেশক্রমে ভীত চিত্ত অপরাধীর জায় কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূর্তিমান বিনয় ও ভক্তি ধর্মরূপী শ্রীগোরাঙ্গ দেবকে দর্শন করিয়া পাপাত্মা চাঁদ কাজির কঠিন হৃদয় কোমল হইল। এতদিন ক্ষুদ্র মনে করিয়া যাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, অদ্য তাঁহার নিকটই হুরাত্মা কাজির মস্তক অবনত হইল। কাজি সমবেত মানব মণ্ডলীর মধ্যে নিমাইকে ঈশ্বরবতার বলিয়া সম্বোধন পূর্বক ক্রমা প্রার্থনা করিলেন এবং আর সংকীর্ণনে বাধা দিবেন না শপথ করিলেন। এই হইতে কাজি বংশ ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠিল। শ্রীগোরাঙ্গের যশঃ সৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, নবদ্বীপ নিকশ্টক হইল।

শ্রীগোরাঙ্গের ভগবন্নিষ্ঠা, অদ্ভুত প্রেম ও অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া ভক্ত হৃদয় উৎফুল্ল হইল বটে, কিন্তু পাপাত্মা ঈর্ষাকলুষিত ধর্ম্ম ব্যবসায়ী নিন্দুকগণের অজ্ঞায় সমালোচনা দূর হইল না। তাহারা উত্তরোত্তর শ্রীগোরাঙ্গের বিরুদ্ধে নানা প্রকার দুর্নাম রটাইতে লাগিল। দুষ্টলোকের দুর্ব্যবহারে শ্রীগোরাঙ্গ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বিশ্বপ্রেমিক, কাজেই এই প্রকার সাংসারিক হিংসা, ঘেঁষ, নিন্দা, গ্লানি তাঁহার ভাল বোধ হইল না। হঠাৎ তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রেম সমুদ্রে যে সুখের জোয়ার প্রবল বেগে আরম্ভ হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহাতে ভাঁটা আরম্ভ হইল।

নিমাই সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে বৈরাগ্য মার্গ অবলম্বন করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। একদিন নিত্যানন্দকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন, “শ্রীপাদ ! আজ তোমাকে আমার মনের কথা বলি শুন, জাতিধর্ম্ম নির্কিঁশেবে

জগতের যাবতীয় পাপক্লিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়া উদ্ধার করি, ইহাই আমার প্রাণের ইচ্ছা ; কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইল না। লোকের ভাল করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখি তাহা হইতেছে না। নিম্নকগণ নগরে নগরে আমার নিন্দা করিতেছে, ক্রমে হিংসা, ঘেব প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি লোকের হৃদয় অধিকার করিতেছে।

তাই মনে করিতেছি আমি সন্ন্যাসী হইব। কোপীন পরিয়া হাতে দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিব। আমার কান্দাল বেশ দর্শন করিলে আর কাহারও মনে ক্রোধ থাকিবে না, সন্ন্যাসীকে কেহই হরিনাম ভিক্ষায় বঞ্চিত করিবে না। এই উপায়ে যদি লোকে ক্লম্ব বলে, তবেই আমি কৃতার্থ হইব। শ্রীপাদ, তুমি ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান কর।”

“ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।

বিধি দেহ তুমি মোর সন্ন্যাস-কারণে।

যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি,

এতেক বিধান দেহ অবতার জানি।”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কিছুকাল নীরব নিষ্পন্দভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, “প্রভু এমন নিষ্ঠুর কার্য্য করিও না। ব্রহ্মা মাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা একবার মনে কর।”

শ্রীগোরাঙ্গ বলিলেন, “আমি সেইজন্যই এতদিন তোমাদের সহিত কীৰ্ত্তনানন্দে মত্ত ছিলাম, কিন্তু তাহা লোকের চক্ষে সহ্য হইল না। তাঁহারা আমার সাংসারিক সুখ সম্ভোগ দেখিয়া হরিনাম লইল না। শ্রীপাদ ! এখন সংসারে থাকিয়া তোমাদের মনস্তত্ত্ব সাধন ও সন্ন্যাসী হইয়া জীবগণের উদ্ধার সাধন এই দুইটার মধ্যে কোন্ট আমার অবলম্বনীয় বলিয়া মনে কর ?” নিত্যানন্দ এই কথায় নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার নয়ন মুগল হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিছুকাল এইভাবে থাকিয়া বলিলেন, “প্রভু তুমি ইচ্ছাময়। তোমাকে বিধি বা নিষেধ কে দিতে পারে ? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।”

“বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে ?

সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

প্রভু এখন বিবম সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন এখন কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ ? যদি সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করি, তবে ভক্তি যোগের উৎকর্ষ দেখান যায় না, কারণ সন্ন্যাস ধর্ম ভক্তি পথের বিরোধী। আর যদি সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক দীনভাব অবলম্বন না করি, তাহা হইলে নাস্তিক মায়াবাদী ও পাষণ্ড জীবগণকে উদ্ধার করা যায় না। অবশেষে প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সন্ন্যাসী হইব, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের ধর্ম—“তত্ত্বমসি” অর্থাৎ “তিনিই আমি” এই তত্ত্ব গ্রহণ করিব না। সন্ন্যাস আশ্রমের সকল দুঃখ স্বীকার করিয়া যোগাভ্যাস না করিয়া কাল্যান বেশে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
 শংখের কুণ্ডল পরি ।
 যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
 যেখানে নিঠুর হরি ॥
 মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে, ঘরে,
 খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে ।
 যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
 বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে ॥”

(জ্ঞান দাসের কবিতা ।)

অবশেষে নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন ।

ক্রমে ক্রমে ভক্তগণও এই নিদারুণ বার্তা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । প্রভুর সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বলিলেন, “সত্যই কি প্রভু আমাদের ছাড়িয়া বাইবেন ?”

ইতোমধ্যে একদিন প্রভু বলিলেন, “কল্যা রজনীতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম—যেন একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে একটি সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিলেন । তাহার পর হইতেই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না । সে মন্ত্রের অর্থ—“তুমি তিনি” থাকিয়া থাকিয়া আমার সেই কথাই মনে হইতেছে ।

নিতাই পূর্বেই প্রভুর আন্তরিক অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন, এখন ভক্তগণেরও এই বিষয় জানিতে বাকী রহিল না । এদিকে প্রভুর

অবস্থার ক্রমেই পরিবর্তন হইতে লাগিল, তাঁহার ভাব ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল, ভক্তগণের কাকুতি মিনতি প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না । একদিন নিমাই নিত্যানন্দকে নিভূতে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রীপাদ ! আমি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, মনন করিয়াছি ; কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলি, একথা যেন বাহিরের লোকে না জানিতে পারে ।”

বলা বাহুল্য এই হৃদয় বিদারক সংবাদ বেশীদিন গোপন রহিল না । ক্রমে ক্রমে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও অত্যাণ্ড ভক্তগণ সকলেই এই সংবাদ জানিতে পারিলেন । শচীর কাতর ক্রন্দনে পাষণ্ড বিগলিত হইল, বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, ভক্তগণ শোকে আত্মহারা হইলেন ; কিন্তু নিমাইয়ের মতের কিছুতেই পরিবর্তন ঘটিল না । তিনি একে একে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও অত্যাণ্ড ভক্তগণকে বুঝাইয়া সংসার পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন । ক্রমশঃ ধর্ম জীবনের প্রাথমিক অবস্থার ত্রায় তাঁহার জীবনে পুনরায় বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইল । তিনি অনতিবিলম্বে (১৪৩১ শকাব্দের মাঘ মাসে) একদিন রাত্রিযোগে স্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ, প্রিয়তমা পত্নীর প্রণয় পাশ ও সংসারের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত পথের পথিক হইলেন ।

নবদ্বীপের সুখ-সুখ্য অস্তমিত হইল । বিষাদ-রজনীর গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছাদিত হইল । নবদ্বীপের চারিদিকেই ক্রন্দনের রোল উঠিত হইল, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল । শচী অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন । কিছুতেই শোকের তীব্র জ্বালা সহ করিতে পারিলেন না, পুত্রশোকে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন । একে পুত্রবাৎসল্য, তাহাতেও নিমাইর মত ছেলে এরূপ ক্ষেত্রে স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে কিরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে পারে, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা

অনুমান করাই সহজ । বিষ্ণুপ্রিয়ায় হৃৎথের কথা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য । তিনি হৃদয় সর্বস্ব প্রিয়তম স্বামীর বিরহে পাগলিনী প্রায় হইলেন । তাঁহার কাতর ক্রন্দনে পাষণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল । ভক্ত-গণ শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন । শচীমাতা নিতাইকে বলিলেন, “বাপ নিতাই ! তুমি আমার নিমাইকে আনিয়া দাও ।” নিতাই বলিলেন, “মা আপনি অধৈর্য্য হইবেন না, স্থির হউন । আমি যেক্ষণেই পারি নিমাইকে আনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাইব ।” এই কথা বলিয়া নিতাই, বক্রেশ্বর, যুকুন্দ, চন্দ্র-শেখর ও দামোদর এই চারিজনকে সঙ্গে লইয়া নিমাইর সন্ধানে কাটোয়ার দিকে ধাবিত হইলেন ।

“চন্দ্রশেখর আচার্য্য পণ্ডিত দামোদর ।

বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সঙ্ঘর ॥

এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায় ।

প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এদিকে শ্রীগৌরান্ধ নবদ্বীপ হইতে রওনা হইয়া বিদ্যাধেগে কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে ভয়ানক শীত, অনাবৃত শরীর, পদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরান্ধ ভাবে বিভোর ইয়া কাটোয়ার সুরধুনী তীরে কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । নিমাই কৃতাজলিপুটে কেশব ভারতীকে প্রণাম পূর্বক গ্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু কেশব ভারতী গৌরান্ধের নবীন বয়স, অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছেন । বিশেষতঃ নিমাইর বুদ্ধ মাতা ও যুবতী ভার্য্যা আছেন,

সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, ইহাই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, “নিমাই ! আমি তোমাকে সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিতে পারিব না, তুমি নবদ্বীপ যাইয়া গৃহধর্ম পালন কর ।” ভারতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগোরাঙ্গ করযোড়ে বলিলেন, “গোঁসাঞি ! আপনি সন্ন্যাস মন্ত্র দিবার জন্য পূর্ব হইতেই আমার নিকট প্রতীক্ষিত আছেন, আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট আসিয়াছি। আশা দিয়া আমাকে নিরাশ করিবেন না ।” ভারতী গোঁসাঞি নিমাইর কথায় অধোবদন হইলেন, আর উত্তর দিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীগোরাঙ্গের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ন্যাস দিতে প্রস্তুত হইলেন।

মস্তক মুণ্ডনের নিমিত্ত নাপিত আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গের ভুবনমোহন মূর্তি দর্শন করিয়া ক্ষুর ধরিতে সাহসী হইল না। অধোবদনে কান্দিতে লাগিল। অবশেষে কষ্টে-মৃষ্টে নিতান্ত আনিচ্ছার সহিত সেই সুন্দর চাঁচর-চিকণ-কেশরাশি চাঁচিয়া ফেলিয়া দিল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সকলেই এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া হায় হায় করিয়া কান্দিতে লাগিল। কেশব ভারতী সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য’ নাম রাখিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ এই-রূপে প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, ভোগসুখ, জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রণয়, অতুল পাণ্ডিত্য ও সামাজিক প্রতিপত্তি প্রভৃতি পার্থিব লোকের প্রার্থনীয় সমুদয় বিসর্জন দিয়া পৃথিবীর সকল লোককে কান্দাইয়া নবীন বয়সে সন্ন্যাস আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখন একটি বংশদণ্ড, একটি কমণ্ডলু, একখানা কোপীন, দুইখানা বহির্কাস ও একখানা ছেঁড়া কাঁথা ইহাই প্রভুর সম্বল হইল। এখন পথ তাঁহার গৃহ, অরণ্য আশ্রয়, ভিক্ষা সম্বল ও ভগবচ্ছিন্তা তাঁহার সঙ্গিনী হইল। প্রভুর পরিধানে গেরুয়া বসন, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, নয়নে প্রেমাক্র, মুখে হরেকৃষ্ণধ্বনি।

তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সৰ্বসাধারণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূৰ্বক বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

প্রভুর গতির বিরাম নাই, পথশ্রমে ক্লান্তি নাই, ভাবাবেশে দিগ্-ভ্রান্ত পথিকের স্থায় একমনে চলিতে লাগিলেন ! এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি রাঢ় দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পূৰ্বমুখী হইলেন। তাহার পর নিত্যানন্দ কোশল করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই প্রভুর সংজ্ঞা লাভ হইল। এদিকে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি শচীমাতা ও অম্বালাভ ভক্তগণকে শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন। শান্তিপুরে নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হইয়াছে জানিতে পারিয়া নবদ্বীপ হইতে দলে দলে দর্শকমণ্ডলী শান্তিপুরে আগমন করিতে লাগিল। শান্তিপুরে পুনরায় নূতন স্রুতের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে ত্রীগৌরাজ অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে কিছুদিন কীর্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া শচী মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূৰ্বক নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই ছয় জন ভক্তও তাঁহার অনুবর্তী হইলেন। শান্তিপুর বিষাদ-রজনীর গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।





অষ্টাদশ অধ্যায় ।



নীলাচল যাত্রা ।

“চলিয়া চলিয়া চলে হরিব’লে গোরা রায় ।

সাজোপাজ সজে ক’রে মাঝখানেে গোরাঙ্গ রায় ॥”

বিরহ-বিধুরা প্রেমোন্মাদিনী কুলকামিনী প্রিয়জনের মিলন আশায় জাতিকুল পরিত্যাগ পূর্বক গৃহের বাহির হইলে যেমন উদ্ভ্রান্ত চিত্তে বিচরণ করিতে থাকে, শ্রীগোরাঙ্গও সেই প্রকার ক্লেশপ্রেমে বিহ্বল হইয়া উদ্ভ্রান্তভাবে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । প্রভুর ভুবন-মোহন মূর্তি, তরুণ বয়স, নয়নে জলধারা, মুখে হরেকৃষ্ণধ্বনি । কোন দিকে দৃকপাত নাই, যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে ভাবাবেশে গজেন্দ্র গমনে চলিয়াছেন । কখন দ্রুতগতি, কখন ধীর পদবিক্ষেপ, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন উচ্চদৃষ্টি, কখন বোর মুচ্ছা । মাঝে মাঝে নিত্যানন্দ ও অন্তরা অন্তরগণের সহিত আলাপ করিয়া বলিতেছেন, “শ্রীপাদ ! আর কত দূর গেলে জগন্নাথের দর্শন পাইব ?”

মহাপ্রভু এইরূপে ভক্তগণসহ উড়িষ্যার পথে রওনা হইলেন। শান্তিপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র যাইতে পথিমধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদয় দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গঙ্গাতীরবর্তী ছত্র-ভোগের অম্বুলিঙ্গ দর্শন করিয়া ওড় দেশের “গঙ্গাঘাটে” স্নান করিলেন। তৎপর জলেশ্বর শিব ও রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া যাজপুরে গমন করিলেন। তথায় বৈতরিণী স্নান ও আদিবরাহ দর্শন করিয়া কটকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহানদীতে স্নান ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন করিয়া ভুবনেশ্বরে গমন করিলেন। তথায় বিন্দু-সরোবরে স্নান ও শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুরীর নিকটবর্তী কমলপুরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া সকলেই ভার্গী নদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন না। তিনি সেই স্থানেই থাকিলেন। ভক্ত জগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিতেন, “আমি তাড়াতাড়ি কিছু ভিক্ষা লইয়া আসি” এই বলিয়া তিনি দণ্ডখানি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া মহাপ্রভুর সহিত গমন করিলেন। এই অবসরে নিত্যানন্দ এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। সকলে চলিয়া গেলে পর নিতাই একাকী নদীর তীরে বসিয়া দণ্ডের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

“দণ্ড তুমি আমার শ্রীগোরাঙ্গের মোহনবাঁশী কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পথের কাঞ্চাল করিয়াছ, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়াছ, ভক্তগণের হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছ, আরও বলি, আমি তাঁহাকে পরমানন্দে হৃদয়ে বহন করি, সেই মহাপ্রভু আবার তোমাকে বহন করিতেছেন, এ দৃশ্য ত আমার চক্ষে নিতান্তই অসহ্য! দণ্ড, তোমার এতদূর স্পর্ধা কেন? ইহার কি উপযুক্ত দণ্ড নাই? আজই আমি তোমার উচিত শাস্তির বিধান করিতেছি।” এই

কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ সেই দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া নদী জলে ভাসাইয়া দিলেন । সেইদিন হইতে ভাগী নদী “দণ্ড ভাগী নদী” নামে খ্যাত হইল ।

এদিকে জগদানন্দ আসিয়া প্রভুর দণ্ড খুঁজিতে লাগিলেন । দণ্ড না পাইয়া ভীতচিত্তে রুদ্ধকণ্ঠে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্রীপাদ প্রভুর দণ্ড কোথায় ?” নিত্যানন্দ বলিলেন, “দণ্ড, দণ্ড, কর কেন ? যে দণ্ড আমাদিগকে এত কষ্ট দিয়াছে, শ্রীগোরাঙ্গকে বৃক্ষতলবাসী করিয়াছে, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে অকূল হৃৎখ সাগরে ভাসাইয়াছে, সেই পরম শত্রু দণ্ডকে আমি নদী জলে ভাসাইয়া দিয়াছি, তুমি চূপ করিয়া থাক ।”

নিত্যানন্দের এতাদৃশ অসম্ভব বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদানন্দ কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন ।

প্রভু প্রেমভরে কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন । নিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, সে সংবাদ লইলেন না । কতক দূর গমন করিলে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া প্রভুর সুখ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । তাঁহার শরীরে ভক্তি উদ্দীপক ভাব গুলি প্রকাশ পাইল । তিনি শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপরে বাণ গোপাল দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া মুহুর্হু হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ।

“অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার ।

বিশাল গর্জনে কম্প সর্বদেহ ভার ॥”

কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ দূরবর্তী ; কিন্তু অতি ধীর পদ বিক্ষেপে গমন করিতে এই অল্প রাস্তা আসিতে প্রভুর বহু বিলম্ব হইল ।

“হাসে কান্দে নাচে গায় হুঙ্কার গর্জ্জন ।

তিন ক্রোশ পথ হইল সহস্র যোজন ॥”

(চৈতন্য চরিতামৃত ।)

প্রভু অহুরাগভরে পৃথিব্যে কখন হাসিতেছেন, কখন কান্দিতেছেন, কখন মুচ্ছিত হইতেছেন, তাঁহার বহির্জগতের দৃষ্টি একেবারে শূন্য, এইরূপ প্রেমাবিষ্টভাবে তিনি আঠার নালায় উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়াই হঠাৎ তাঁহার দণ্ডের কথা মনে পড়িল। তখন শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, “শ্রীপাদ! আমার দণ্ড কোথায়? নিত্যানন্দ মনে করিয়াছিলেন, প্রভু যখন দণ্ডের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন আর সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবেন না, কিন্তু এখন প্রভুকে হঠাৎ দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করাতে নিতাই নিরুত্তর হইলেন।

প্রভু জগদানন্দের পানে তাকাইলেন, জগদানন্দ বলিলেন “আমাদের দিকে চাহিতেছেন কেন? শ্রীপাদকে জিজ্ঞাসা করুন।” অনন্তর প্রভু কর্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন “বাশ-ধানা তিন খণ্ড হইয়া গিয়াছে” প্রভু বলিলেন “কেন কাহারও সহিত মারামারি করিয়াছ না কি? নিত্যানন্দ বলিলেন “তুমি যখন মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন তোমাকে আমি ধরিয়া আনিবার সময় আমাদের দুইজনের ভরে বাশধানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।” তখন জগদানন্দ বলিলেন “প্রভু, শ্রীপাদ রহস্য করিতেছেন, আমি স্বরূপ কথা, বলি, শ্রীপাদ যখন ভার্গবী নদী তীরে একাকী ছিলেন, তখন আমি দণ্ড তাঁহার হস্তে দিয়া ভিক্ষায় গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় নিত্যানন্দ যেন কি ভাবিয়া দণ্ডধানা ভাঙ্গিয়া নদী জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু নিত্যানন্দের উপর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ

করিয়া বলিলেন “শ্রীপাদ ! তুমি দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন ?” নিত্যানন্দ বলিলেন “আচ্ছা ভাঙ্গিয়া থাকি, ভালই করিয়াছি, একখানা বাঁশ বইতো নয়, না হয় আর একখানা দেওয়া যাইবে।” মহাপ্রভু এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষাদ-ভরে বাললেন “যে দণ্ডে তেত্রিশকোটি দেবতার বাস, তোমার নিকট একখানা সামান্য বাঁশ হইল ?” তোমরা আমার সঙ্গে আসিয়া যথেষ্ট উপকার করিলে ? সন্ন্যাসীর সর্বস্বধন দণ্ডটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, আমি আর তোমাদের সহিত যাইব না। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমাকে একাকী যাইতে দাও।”

প্রভু পশ্চাতে গেলে হয় তো ভাবাবেশে কোথায় থাকিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ বলিলেন “তবে তুমি অগ্রে গমন কর, আমরা পশ্চাৎ যাইতেছি।” “ভাল, তাহাই হউক” এই বলিয়া প্রভু তথা হইতে দ্রুতগতিতে পুরীপথে ধাবিত হইলেন। অল্প-কাল মধ্যেই পুরীধামে পৌঁছিলেন। তারপর তড়িৎ গতিতে পুরীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি দর্শন মাത്രেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভগবন্তক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে অমনি প্রভু মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভারত বিখ্যাত নবদ্বীপের জ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্কর্ভোম ঐ সময় জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন, তিনি এই নবীন সন্ন্যাসীর দেহে শাস্ত্রোক্ত ভক্তি-প্রকাশক উচ্চ ভাবগুলি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। এবং বহন করাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। কিছুকাল পরে মহাপ্রভুর মূচ্ছাভঙ্গ হইল। এদিকে তাঁহার সহযোগী নিত্যানন্দাদি ভক্তগণও পুরীধামে আসিয়া প্রভুর অনুসন্ধান লইলেন এবং লোকমুখে সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া সার্কর্ভোম গৃহে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া আনন্দে

উৎফুল্ল হইলেন । বাসুদেব সার্কর্ভোম জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক । তিনি সন্ন্যাসীর অমানুষিক প্রতিভা, অতুল্য জ্ঞান ও অসাধারণ দৈব-
 তেজঃ দর্শন করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে
 ভগবদ্ভাবে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন । প্রভুর বিদ্যাবতার নিকট সার্ক-
 র্ভোমের জ্ঞানগর্ভ খর্ব হইল । কিন্তু নৈয়ায়িক স্মলভ সন্দেহ ও
 অবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দূর হইল না । অতঃপর একদিন শ্রীগোরাঙ্গের
 বড়ভুজমূর্তি দর্শন করিয়া সার্কর্ভোম কৃতার্থ হইলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য-
 ভিমান দূর হইল, সকল সংশয় ভঞ্জন হইল, হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইল ।
 তিনি শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান জানিয়া তদীয় শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ
 করিলেন । এই দৃষ্টান্ত দর্শনে নীলাচলের স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রও
 প্রভুর চরণে মস্তক অবনত করিলেন । এইরূপে মহাপ্রভু ভক্তির
 বজ্রায় নীলাচল ডুবাইয়া দিলেন ।





উনবিংশ অধ্যায় ।

সার্কর্ভোম গৃহে নিত্যানন্দ ।

“রাম রাঘব, রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং ।

কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥”

এদিকে নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সার্কর্ভোম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ নিত্যানন্দের ভুবন মোহন রূপ ও অমানুষিক দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া সার্কর্ভোম তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিলেন। যে কয়েকদিন মহাপ্রভু সার্কর্ভোম গৃহে অবস্থান করিলেন, সার্কর্ভোম সে কয়েকদিন পরম যত্নে গৌর নিতাই দুই ভাইকে আহার করাইলেন।

ইতোমধ্যে একদিন শ্রীমদ্বিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিলেন। ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখ ভাগে যাইয়া নিত্যানন্দ ঙগবৎ-প্রেমে বিভোর হইলেন; কোন মতেই

স্থির থাকিতে পারিলেন না। উদ্দাম চরিত নিত্যানন্দ দ্রুত পাদ-
বিক্ষেপে বলরাম আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন, তিনি বিদ্যুৎঘেগে
যাইয়া একবারে বলরামের সুবর্ণ সিংহাসনে উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন
করিলেন । এবং বলরামের গলার মালা লইয়া নিজে ধারণ করিলেন ।

“শ্রীচৈতন্যরসে নিত্যানন্দ মহাদীর ।

পরম উদ্দাম কোন স্থানে নহে স্থির ॥

জগন্নাথ দেখিয়া যাতেন ধরিবারে ।

পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥

একেবারে উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে ।

বলরাম ধরিয়া করিল আলিঙ্গনে ॥

নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার ।

মালা লই পরিলেন গলে আপনার ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দের এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত
হইল এবং ঈশ্বর জ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিল । মহাপ্রভু এইরূপে
নীলাচলে তিনমাস কাল অতিবাহিত করিয়া জীব উদ্ধার ও ভক্তি ধর্ম
প্রচার করিবার নিমিত্ত বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশের তীর্থ পর্য্যটন
করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ভক্তগণের নিকট বিদায় চাহিলেন ।
নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন
“তাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব ।” ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ
বলিলেন “কেন আমার অপরাধ কি ?” প্রভু বলিলেন “শ্রীপাদ,
তোমার সাক্ষাতে আমি ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে পারি না,

স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও, তোমরা কোনরূপ আন্তরিক কষ্ট পাইলেও আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়, কাজেই আমি তাহা করিতে পারি না। দেখ আমি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ঘুরাইয়া শান্তিপুর আনয়ন করিলে। তারপক্ষ সন্ন্যাসীর সর্বস্বধন আমার সহচর দণ্ডটী তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, তোমরা আমাকে ভালবাসিয়া এই সমুদয় কাজ কর বটে ; কিন্তু তাহাতে আমার কর্তব্য কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।” নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া নিরুত্তর হইলেন। তখন দামোদর কহিলেন “প্রভু, আমার দোষ কি ?” প্রভু বলিলেন তুমি ব্রহ্মচারী আমি সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী। আমি সন্ন্যাস ধর্ম্মের সমুদয় নিয়ম মনে রাখিতে পারি না এবং পালনও করিতে পারি না ; কিন্তু তুমি সমুদয় নিয়ম পালন করিয়া থাক ও সর্বদা আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাক। তোমার সাক্ষাতে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিতে যাইয়া আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করিতে পারি না।”

জগদানন্দ বলিলেন “প্রভু, এ দাসকে ভুলিবেন না।” প্রভু বলিলেন “তুমি তো বচন বাগীশ, আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম যাহাতে নষ্ট হয়, তোমার কেবল সেই চেষ্টা। তোমার ইচ্ছা যে আমি সংসারী হইয়া ভোগ সুখে রত থাকি ; কিন্তু এই সমুদয় আমি করিতে পারিব না। আমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত যদি তোমার কথা রক্ষা না করি, তাহা হইলেই হয় তো তুমি আমার সহিত রাগ করিয়া কথা বলা বন্ধ করিবে।” তোমাদের সকলের কথাই বলিলাম, এখন প্রসঙ্গাধীন যুকুন্দের কথাও কিছু বলা আবশ্যক। যুকুন্দ আমার পরম ভক্ত বটে ; কিন্তু তাহার হৃদয় বড়ই কোমল, সে আমার শীতকালে তিন বেলা স্নান, মৃত্তিকায় শয়ন ও অনশন কষ্ট দেখিয়া বড়ই কাতর হয়, তবে সে সাহস করিয়া

মুখে এই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করে না, কিন্তু আন্তরিক দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাহার বিষাদ-ব্যঞ্জক বদনমণ্ডল দেখিয়া আমি এ সব বেশ বুঝিতে পারি। এইরূপে প্রভু দোষচ্ছলে গুণ বর্ণন করিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, গদাধর প্রভৃতিকে সঙ্গে লইতে অস্বীকৃত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই বিষাদভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু ভক্তগণকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। বলিলেন “তোমরা আমার প্রিয়ভক্ত, আমি তোমাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তোমাদের নিকট আমি সর্বদা বাধা আছি; তবে এবার আমি কিছুদিনের জন্য একাকী দক্ষিণদেশে যাইব। তোমরা এখানে থাক, আমি পুনরায় শীঘ্রই এখানে প্রত্যাগমন করিব।”

নিত্যানন্দ বলিলেন “প্রভু, যদি নিতান্তই যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আর আমরা কেন বাধা প্রদান করিব? তবে একাকী যাওয়া আমি উচিত বোধ করি না।” মহাপ্রভুর মন একটু শিথিল হইল। তিনি নিত্যানন্দের আগ্রহাতিশয়ে কৃষ্ণদাস বিপ্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। প্রভু, দক্ষিণদেশে যাওয়ার সঙ্কল্প স্থির করিয়াও সার্বভৌমের অহরোধে আরও পাঁচদিন তাহার গৃহে বাসস্থান করিলেন। পাঁচদিন পরে মহাপ্রভু, “তবে আমি চলিলাম।” এই কথা বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন। ভক্তগণ বিষাদাগরে মগ্ন হইলেন। প্রভু, শ্রীজগন্নাথের মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলেন, ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইলেন। অবশেষে শ্রীজগন্নাথের নিকট হইতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণের আজ্ঞা লইয়া মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ গুপ্তে বাহির হইলেন। পশ্চাতে ভৃত্য কোপীন, বহির্কাস ও জলপাত্র লইয়া চলিলেন।

মহাপ্রভু, ব্যাকুল হৃদয়ে ভূত্যের সঙ্গে চলিলেন এবং

“রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং ।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥”

এই সুমধুর কীর্তন শুনাইয়া জগজ্জনকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহার ভুবনমোহনমূর্তি যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল এবং তাঁহার প্রাণমন স্নিগ্ধকারী হৃদয়দ্রবকারী মধুর কীর্তন যে শুনিল সেই ভক্তি পথের পথিক হইল । শ্রীগোরাঙ্গ এইরূপে এক বৎসর নয়মাস কাল দক্ষিণদেশের তীর্থাটন করিয়া পরবর্তী বর্ষের মাঘমাসে পুনরায় পুরীধামে প্রত্যাগমন করিলেন । এইকাল পর্য্যন্ত নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই প্রভুর অপেক্ষায় পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাপ্রভুর আগমনে গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন । নীলাচলে পুনরায় হরিনামের বিজয়-দ্বন্দ্বুভি বাজিয়া উঠিল, স্মৃথের উৎস ছুটিতে লাগিল, প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল ।





বিংশ অধ্যায় ।

—

নীলাচলে প্রত্যাগমন ।

“কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।

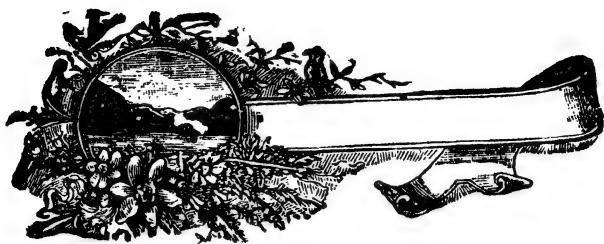
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ ।”

শ্রীগোরাঙ্গ নীলাচলে উপস্থিত হইলে নিত্যানন্দ পরমানন্দে বিভোর হইলেন। পরম ভক্ত কৃষ্ণদাস এই শুভ-সংবাদ বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে দেওয়ার জ্ঞাত্য নবদ্বীপ গমন করিলেন। গোড়ীয় ভক্তগণ এই মঙ্গলবার্তা শ্রবণমাত্র দ্রুতগতিতে দলে দলে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। অঐত প্রভু, শিবানন্দ সেন, নরহরি, হরিদাস প্রভৃতি শত শত ভক্তগণ এই সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্রীগোরাঙ্গও ভক্তগণকে পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। নীলাচলে পুনরায় প্রেমের বজা ও ভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল। ভক্তগণ আনন্দের উত্তাল তরঙ্গে পুনরায় নবভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে গৌর নিতাই দুই ভাই ভক্তগণসহ রথযাত্রা, হোরাপঞ্চমী, দীপাবলী, উখান দ্বাদশী

প্রভৃতি নীলাচলোৎসবগুলি দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। গোড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া দিলেন যে “প্রতি বৎসর রথযাত্রার উপলক্ষে আপনারা নীলাচলে আসিবেন, তাহা হইলৈ আপনারদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন হইবে এবং আমিও আপনাদিগকে দর্শন করিয়া সুখী হইব।” প্রভু, শচীমাতার জ্ঞাত শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ তাঁহাদের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর বিরহে ভগ্নমনে অনিচ্ছার সহিত গৃহে গমন করিলেন।

অতঃপর প্রভু রুন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু সার্বভৌম প্রমুখ ভক্তগণের অনুরোধে তাঁহাকে আরও দুই বৎসর কাল নীলাচলে থাকিতে হইল। এইরূপে চারি বৎসর অতীত হওয়ার পর মহাপ্রভু শ্রীরুন্দাবনে যাওয়ার জ্ঞাত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং নীলাচল হইতে ভক্তগণসহ শান্তিপু্রে গমন করিলেন। নিত্যানন্দও সঙ্গে চলিলেন। শচীমাতা বহুদিনের পরে গৌর নিতাই দুই ভাইকে পাইয়া যে কতদূর আনন্দিতা হইলেন, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। শান্তিপু্রের ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া বিমল-সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। শান্তিপু্র হইতে মহাপ্রভু “কানাইর নাটশালা” পর্য্যন্ত গমন করিলেন। নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। এই স্থানে আসিলে পর সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীকৃপ আসিয়া শ্রীচৈতন্ত-দেবের সহিত মিলিত হইলেন। কৃপ সনাতন দুই ভাই গোড়াধিপতির মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীচৈতন্তের ঐশীশক্তি, অমাহুষিক প্রেম ও অতুল বৈরাগ্য দর্শন করিয়া তাঁহারা মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ পূর্বক মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। এ যাত্রায় আর শ্রীমহাভু্র রুন্দাবনে যাওয়া ঘটিল না, “কানাই নাটশালা” হইতেই পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।



একবিংশ অধ্যায় ।

•••••

গৌড়ীয়যুগে নূতন ধর্ম ।

“যৎ কস্মভির্ঘন্তপসা, জ্ঞানবৈরাগ্যাতশ্চ যৎ
যোগেন দানধর্ম্যেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি
সর্বং মন্তুক্তিযোগেন মন্তুক্তো লভতেহজ্ঞসা ॥”

(শ্রীমদ্ভাগবত ।)

সামু-হৃদয় বিশ্বজনীন প্রেমের অনাবিল প্রস্রবণ । উহা
হইতে যে প্রবল প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে, তাহা কিছুতেই নিরস্ত
হয় না ; উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়। অবশেষে সমগ্র বিশ্ববাসী জনগণকে
প্রেমের বজ্রায় ভাসাইয়া দেয় । আজ মহাপ্রভুর পক্ষেও এ নিয়মের
অত্রথা ঘটিল না । গৌড়ীয় ভক্তগণের যোগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে
বলিয়া, মহাপ্রভুর করুণ হৃদয়ে যেন নূতন ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল ।

তিনি দেখিলেন যে ধর্মজগতের নেতৃগণ প্রায় সকলেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বৈরাগ্য-মার্গে ধাবিত হইতেছেন । ইহাতে একদিকে যেমন ধর্মজগতের উন্নতি, অপরদিকে তেমনই লৌকিক জগতের ধোরতর অবনতি । কারণ প্রায়শঃই দেখা যায় যে সাধারণ মানবগণ অধিকাংশই আদর্শ জীবনের অনুকরণ করিয়া থাকে । সমাজের আদর্শ-চরিত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকেও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নাই । মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ, দামোদর প্রমুখ অনেক ভক্তগণ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিলেন, রূপ সনাতন গৃহত্যাগ করিলেন, এইরূপে সংসার ধর্ম পরিত্যাগই যেন লোকে ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিল । কিন্তু সংসার পরিত্যাগ করাই ধর্মের একমাত্র পথ নহে । সপ্রেম ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় । ইহা গৃহাশ্রমে থাকিয়াও লাভ করা যাইতে পারে, মহাপ্রভু এখন তাহাই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য মনে করিলেন । কিন্তু কি উপায়ে এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, ইহাই এখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল ।

প্রিয় পাঠক ! প্রবৃ্ত্তি-সংঘমনাবতার শ্রীগৌরান্ন নিজে কঠোরতপা সন্ন্যাসী হইয়া কলির জীবের পক্ষে ভক্তিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন কেন, এই সন্দেহ বোধহয় অনেকেরই চিন্তে উপস্থিত হইতে পারে ; এজন্ত প্রসঙ্গাধীন জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে । আধ্যাত্মিক জগতে জীব ও পরমাত্মার মিলনের জন্ত দুইটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে । একটা জ্ঞানযোগ ও অপরটা ভক্তিয়োগ । জীবের নিজ শক্তিতে পরমাত্মার অবেষণে যাওয়ার নাম জ্ঞান, আর ভগবানের ঐশ্বর্য্যতাব হইতে তুমি প্রভু, আমি দাস এই জ্ঞানের যে

অভিব্যক্তি তাহাকে ভক্তি বলে। জ্ঞান পুরুষ সে বাহির বাটীর খবর দিতে পারে, ভক্তি স্ত্রীলোক সে অন্তঃপুরের সমাচার দিতে সমর্থ। জ্ঞান নিষ্কাম, ভক্তি সাকাম। জ্ঞানের পথ বহু বিঘ্ন-সঙ্কুল, ভক্তির পথ কোমল কুসুম-বিকীর্ণ। জ্ঞানীর হৃদয় বজ্র সন্ধ্য কঠোর, ভক্ত হৃদয় করুণ-রসে আর্দ্র। জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানিবার জ্ঞাত ব্যগ্র হয়, ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার করে, ব্রহ্ম সত্য, জগন্নিখ্যা এই তর্কে উপস্থিত হয় এবং শেষে সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে; আর ভক্ত ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করে, তাঁহার অনন্ত মহিমা ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার স্তুতি করে এবং প্রেমময় বিভূকে সর্ব্বাপেক্ষা নিজ জন মনে করিয়া তাঁহার নিকট সাক্ষর আশ্রয় নিবেদন জ্ঞাপন করে। জ্ঞানমার্গাবলম্বীকে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, আর ভক্তিমান পুরুষ ঘরে বসিয়াই তাঁহাকে পায়। জ্ঞানী “অহংব্রহ্ম” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া আত্মতাব প্রকাশ করে, আর ভক্ত দাস্যতাবে অনুপ্রাণিত হইয়া “প্রভো! আমি ক্ষুদ্রজীব, এই জীবাধমকে তোমার চির দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ কর।” এই কোমল ভাব ব্যক্ত করিয়া স্বীয় দীনতা প্রকাশ করে। জ্ঞানীর মুক্তিলাভই চরম লক্ষ্য; কিন্তু ভক্ত তাহার বিরোধী; ভক্ত বলে, * “আমি মুক্তি চাহি না আমি ভক্তি চাই। আমি মরিতে চাহি না, কিন্তু বাঁচিতে চাই। আমি মিশিতে চাহি না, কিন্তু ভাসিতে চাই। আমি যদি মরিয়া যাই, আমি যদি সাগরে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে সাগরের বক্ষকে তক্তকে কায়া, গলিত রক্তময় ছায়া, কল গম্ভীর নিনাদ এ সমস্ত কে দেখিবে? কে শুনিবে? আমি যদি তাঁহাতে মিশিয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার শ্রামশুন্দর ভাবে ঢল ঢল মোহনমূর্ত্তি, সে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে হাসি মুখের ললিত ভাস্বর রমণীয় কান্তি, সে

* এই অংশ শ্রীভূদেব কবিরচিত্ত কৃত “ভিখারী” নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

ভুবনমোহিনী বাঁশরীর কাকলি,—এ সমস্ত কে দেখিবে? কে শুনিবে? আমি এ সমস্ত বড় ভানবানি। তোমার (অদ্বৈত বাদীর) মুক্তিতে ভানবাসা নাই। তাহাতে প্রিয়দ্বও নাই অপ্রিয়দ্বও নাই। আমার ভক্তিতে প্রিয় নহে, অপ্রিয় নাই। দুনি বসিতেছে প্রিয়দ্বাপ্রিয়দ্ব বর্জিতই পরমানন্দ। আমি বলিতেছি,—অপ্রিয়দ্ববর্জিত প্রিয়দ্বই পরমানন্দ। তঁহার মুক্তির কাহ্নে প্রিয়দ্বকে হারাইতে হয়, আমার ভক্তির কাহ্নে প্রিয়দ্বকে সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। যাহা প্রিয় তাহাই চাই; যাহা প্রিয় ইতে পূনক, তাহার আবশ্যক নাই।”

যাহা হউক যদিও জ্ঞান এবং ভক্তির পৃথক স্বাস্থ্যং সম্বন্ধে বর্তমান আছে বটে, তির পরোক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বস্তুতঃ সর্বতোভাবে উভয়ের মিশ্রণই আবশ্যক। কারণ ভক্তি বিহীন যে জ্ঞান তাহা এক-দেশদর্শী; তদ্বারা আত্মার পুষ্টি হয় না। এ সম্বন্ধে উপনিষদ্বাক্যও বলিয়াছেন—

“না বিদিত্তা দুষ্চরিতাং না শাস্তো না সমাহিতাঃ ।

না শাস্তো মানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈমাপ্নুয়াৎ ॥”

(উপনিষদ্ব।)

নাও সমাহিত সচরিত্র না হইলে কেবল বিজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে নাহি জানা যায় না। এইরূপ জ্ঞান বিহীন ভক্তি দ্বারাও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। কারণ ভক্তি বিহীন ভক্তি এক বিশেষ ব্যাপ্তি আর কিছুই নহে। এইজগৎ জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণই সুখকর। জ্ঞানের সহিত প্রেম ভক্তির সংযোগ না হইলে তদ্বারা লক্ষ্য স্থানে পৌঁছান অস্বকটন। ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে উহার

ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ সম্বন্ধে জ্ঞানৈক চিন্তাশীল ব্যক্তি যাহা বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন প্রসঙ্গাধীন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার উপসংহার করিতেছি।

“জ্ঞান ও ভক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হয়, তাহারা যেন ভ্রাতা ভগিনী, ভ্রাতা একটু বড়, ভগিনী ছোট, ভ্রাতা একটু বুঝমান, ভগিনী অবুঝ—আব্দারে, বুঝমান ভ্রাতা অবুঝ ভগিনীর যেমন শত্রু নহে—বন্ধু, জ্ঞান ও ভক্তির তেমনিই শত্রু নহে; জ্ঞান ও ভক্তি ভায়ে পোনে হাত ধরাধরি করিয়া সে পথে চলে, যে পথ বড় পিচ্ছিল—যেখানে একেলা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, বড় বুঝমান ভ্রাতা যেমন ভগিনীকে ছাড়িয়া মাতৃ-সন্নিধানে একাকী উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মাতৃ-সন্নিধানে যাইতে সাহস করেনা। যতক্ষণ ভক্তি না আসে জ্ঞান দাঁড়াইয়া থাকে, পরে ভক্তি আসিলে তাহার হাত ধরিয়া ছোট ভগিনীকে আগে আগে করিয়া জননীর সন্নিকটস্থ হয়। ভগিনীকে ফেলিয়া ভ্রাতার যেমন মা হৃগ্ধে প্রবেশের অধিকার নাই, তেমনি ভক্তিকে ফেলিয়া জ্ঞানও একাকী মাতৃসকাশে যাইবার অধিকার পায় নাই। কিন্তু ভক্তির কথা স্বতন্ত্র; অবুঝ ভগিনী ভ্রাতা আসিল কিনা অত দেখে না, ভীত হরিণ শিশু যেমন তীরবেগে মাতৃবক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যায়, ভক্তি তেমনি ভ্রাতাকে সঙ্গে পায় ভালই নতুবা একাই তীর বেগে জননীর নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে সে কাঁদিত না সত্য, কিন্তু তাহা যদি নাই হইল,—সে কাঁদে, আর সে স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাকে,—যেখানে গেলে ভয়ের হস্ত হইতে সে চিরকালের মত উত্তীর্ণ হইবে।”

(প্রেমাজলি।)

পাঠক! এখন অবশ্য বুঝিতে পারিলেন যে জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিপথ সংসারাত্মীর পক্ষে অবলম্বনীয় কেন? কলির জীব এতই

শিগ্গোদর পরায়ণ কর্তব্যজ্ঞান বিহীন যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, “যে সআমাতেই মুদয় অর্পণ করিবে । অভ্যাস কর ।”*

জীব বলিতেছে, না এত কঠোর নিয়ম পালন করিতে পারিব না । যদি তাহা না পার তবে বিহিত কন্মের অনুষ্ঠান কর । জীব বলিতেছে না তাহাও পারিব না, যদি তাহা না পার, তাহা হইলে মৎকন্ম পরায়ণ হও ; জীব বলিতেছে না তাহাও পারিব না তখন ভগবান বলিয়াছেন যদি তাহাও না পার তবে আমার গুণানুবাদ শ্রবণ করিবে, সংসঙ্গে থাকিবে, যেখানে হরিকথা হয় তথায় যাইয়া ভগবদ্ গুণানুবাদ শ্রবণ করিবে এবং নির্জনে বসিয়া ভুবন মঙ্গল শ্রীহরিনাম জপ করিবে । তাহা হইলেই তোমাদের সিদ্ধিলাভ ঘটবে ।

“দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে ।

জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল আচার উদ্ধারে ॥”

(চৈতন্য চরিতামৃত ।)

কলির জীব ভগ্নস্বাস্থ্য, অল্লায়ু, হীনবীর্য্য, কাজেই তাহাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । এই জগত্ই মহাপ্রভু জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করিলেন যে “সপ্রেম ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় ।”

চৈতন্যদেবের এই সার্বজনীন ধর্ম্মমতকে অনেকে সাম্প্রদায়িক ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে । ভক্তিগুণে আচণ্ডাল সকলেই মুক্তির অধিকারী । এই উদার মত কখনই

* “যৎ করোসি যদশ্বাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥”

(গীতা ।)

সাম্প্রদায়িক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না । ভক্তিসুত্রকার মহর্ষি শাঙিল্য “ঈশ্বরে পরানুরক্তিকে” ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । শ্রীগৌরানন্দদেবের মতেও এই অহেতুকী ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সন্ততি ভগবানের মধুরত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে । “অপিনি মিহি স্যাদেব বলিয়াছেন “মুক্তিলাভের পথে আত্মসমর্পণই যোগ্য প্রক্রিয়া । তাই ভক্তিমান বৈষ্ণব মাত্রেই মুক্তিলাভের অধিকারী ; কিন্তু যাহারান তা হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা কর্তব্য । বস্তুতঃ অনাসক্ত চিত্তে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহার প্ররোপণ হওয়াই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র পথ ।”

ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীগৌরানন্দদেবের এই মার্কটোমিক মত বর্ণনাকল্পিত হইলেও সাম্প্রদায়িক ভাবে গৃহীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই । কারণ এ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বহিঃস্ব ধর্ম মহাপুরুষগণের ব্যক্তিগত স্বাধীন মত থাকিলেও অন্তঃস্ব ধর্ম সকলেরই সমতা বিদ্যমান আছে । এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মহাপুরুষগণের ধর্মমত আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে একমাত্র মুক্তিলাভ সকলেরই চরম লক্ষ্য ।

১। “আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনই

মুক্তিলাভের উপায় ।”

(উপনিষৎ)

২। “বিশ্বব্যাপী মৈত্রী ।”

(গীতা)

৩। “আপনাকে আপনি দেখ ।”

(মৈত্রী)

৪। “পৃথিবীতে সর্গরাজ্য ।”

(ঈশ্বর মত)

৫। “একমাত্র ঈশ্বরের পূজা অপর সকল

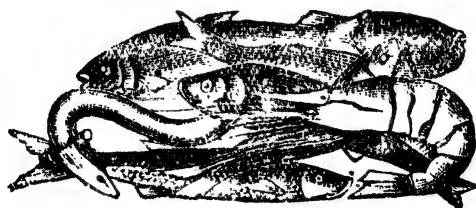
দেবপূজার প্রতিবাদ ।”

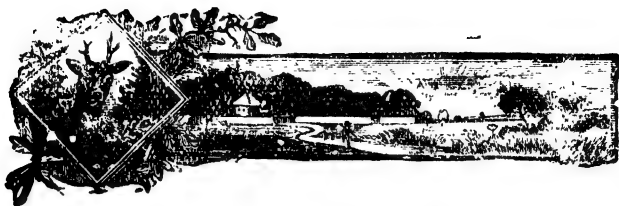
(মহানন্দ)

- ৬। “ধর্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।” (মার্টিন লুথার)
 ৭। “মানব প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা উন্নতি।” (থিওডোর পার্কার)
 ৮। “জগতের প্রত্যেক বস্তুই নিয়মের অধীন।” (অগষ্ট কোমত্)
 ৯। “সম্প্রদায়িকতা হইতেই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়।” (শ্রীচৈতন্যদেব)

উল্লিখিত বিভিন্ন মতাবলম্বী মহাপুরুষগণের ধর্মমতগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকেই বিভিন্ন পথগামী ; কিন্তু গন্তব্য স্থান সকলেরই এক। এবং ইহাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা বা সাম্প্রদায়িকতা বিন্দুমাত্রও নাই। এই একদেশদর্শিতাবিহীন সার্বভৌমিক মত প্রচার করাই শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষত্ব এবং এই জগতই বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি এত সুদৃঢ়। ধর্ম জগতে বহুবিধ অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণব সনাজ আজিও অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান আছে ; এবং এখনও যে হিন্দুগণ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে ভক্তিতরে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন, ইহা তাহারই একমাত্র ফল।

বস্তুতঃ একদেশদর্শী বিচারবুদ্ধি বিহীন মানবগণ সাম্প্রদায়িকতা বিন্যস্ত হইয়া প্রকৃত সাধু পুরুষের আদর করিতে শিক্ষা করিলে, প্রযুক্তি সংযমনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যে, সকল দেশীয়, সকল সম্প্রদায়স্থ “আদর্শ পুরুষ” রূপেই পরিগণিত হইবেন তাহা যথেষ্ট বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।





দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

মহাপ্রভুর নূতন কৌশল ।

“প্রভু বলে, শুন নিত্যানন্দ মহামতি ।

সত্ত্বর চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥”

মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম প্রচার করিবার জন্তই একান্ত উৎসুক হইলেন । কিন্তু কিরূপ ভাবে এই মহৎকর্ম সম্পন্ন করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিবার পরে স্থির করিলেন যে এই কঠোর কার্য অল্প সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে । কারণ প্রলোভন পূর্ণ ও বিপদ সঙ্কুল সংসারের মধ্যে থাকিয়া নিকাম ভাবে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতঃ ভগবচ্চরণারবিন্দের মকরন্দ পানে তৃপ্তিলাভ করা ও ধর্ম জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ধর্মোন্মুখী করা সহজ কার্য্য নহে । তাই সবিশেষ আলোচনা করিয়া উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ, প্রশংসায় অবিচলিত এবং ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত জিতেজ্জিয় শ্রীভগবানের অবতার স্বরূপ শ্রীমদ্বিত্যানন্দ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করাই সমীচীন মনে করিলেন ।

একদিন মহাপ্রভু বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন মহাপ্রভু করুণ দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া কাতরভাবে বলিলেন, “শ্রীপাদ ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, মুখ, নীচ, দরিদ্র জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই প্রেম দান করিব ; কিন্তু আমার সে বাসনা পূর্ণ হওয়ার উপায় দেখিতেছি না। আমি সন্ন্যাসী হইলাম তুমিও গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মুনিধর্ম অবলম্বন করিলে, তবে আর কিরূপে অধম জীবগণ উদ্ধার পাইবে ?” এই কথা শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ ছল ছল চক্ষে নির্ঝাঁকু হইয়া থাকিলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রভু বলিলেন, “শ্রীপাদ ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে তুমি ব্যতীত এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার অন্য উপায় নাই। তাই বলি তুমি অবিলম্বে গোড়দেশে গমন করতঃ সংসার ধর্ম অবলম্বন কর। এবং পাপক্লিষ্ট জীবগণকে প্রেমভক্তি দান করিয়া উদ্ধার কর।” ভক্তিগুণে আচণ্ডাল সকলেই মুক্তির অধিকারী জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিতে হইবে।

“প্রভু বলে, ‘শুন নিত্যানন্দ মহামতি !

সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বাপ প্রতি ॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে ।

মুখ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমমুখে ॥

তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম করি ।

আপন উদ্ধাম ভাব সব পরিহরি ॥

তবে মুখ নীচ যত পতিত সংসার ।

বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥

ভক্তি রস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে ।
 তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে ॥
 এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও ।
 তবে অবিলম্বে তুমি গোড়দেশে যাও ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

একমাত্র সংসারাত্মক পরিত্যাগ করাই ধর্মের অঙ্গ নহে, গৃহে থাকিয়াও ভগবদনুগ্রহ লাভ হইতে পারে, জীব জগতে এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনই মহাপ্রভুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তাই সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বী পরম সাধু নিত্যানন্দকে প্রভু পুনরায় মুনি ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ গৃহী হইতে আদেশ করিলেন ।

“তুমি যাহা গোড়দেশে করিতে সংসার ।

তবে এই সব জীবের হইবে উদ্ধার ॥

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর এই প্রকার কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন ; এবং কিছুকাল মৌনাবলম্বন করিলেন । যিনি এত কাল যাবৎ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই ধর্ম পরিত্যাগ করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমাণ করাই সহজ । এক রকমে আবদ্ধ বিভিন্নাদিকে প্রাবল্য পশুদ্বয়ের যেক্রম বিধম কষ্ট হয়, এক ধর্মাবলম্বী শ্রীগোরাঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছাকৃত গৃহধর্ম অবলম্বন করাও নিত্যানন্দের পক্ষে সেই প্রকার কষ্টকর হইল । নিত্যানন্দ অবশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষাদভরে উত্তর করিলেন, “প্রভু, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজই করিতে

পারিব না। তুমি যে ভাবে চালাইবে আমাকে সেই ভাবেই চলিতে হইবে। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।”

“যোরে কঠিতেছ পুনঃ করিতে সংসার,

অপমানে যতি ধন্য করিলে স্রীকার।

অপ্তাকারী দাস অপ্তা লজ্বিতে না পারি।

যান যে আজ্ঞা হয় তাহা শিরে ধরি ॥”

(নিঃ বংশধস্তার ।)

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দকে সকল কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া ধর্ম জগতের গুহ্য রহস্য ব্যক্ত করিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দও মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া প্রকল্পচিন্তে স্রীকার করিলেন : কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিবেন না, নিত্যানন্দের পক্ষে ইহাই গুরুতর কষ্টের কারণ হইল। পতি গৃহে গমনোন্মুখী কামিনী যে প্রকার মাতাপিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সজল নয়নে শঙ্করালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইমিত্যানন্দও সেই প্রকার মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ ভগ্নচিন্তে ভক্তগণ সহ গোড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোড়ীয় যুগে নূতন ধর্ম প্রবর্তন জন্য পরমভক্ত রামদাস, গদাধর দাস, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি অন্তরঃ ভক্তগণও তাহার সঙ্গী হইলেন। নিতাইচাঁদ গোড়ে গমনকালে ভক্তগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া সকলকেই প্রেমময় করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের দেহেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবির্ভাব হইল। ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়া ভক্তগণ সকলেই আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। বৈকুণ্ঠাগ্রগণ্য রামদাসের শরীরে, গোপালভাব

প্রকাশ পাইল । তিনি যাইতে যাইতে ভাবে বিভোর হইয়া পশ্চিমধ্যে তিনগ্রহরকাল অজ্ঞানাবস্থায় ত্রিভঙ্গভাবে অবস্থান করিলেন ।

“পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয় ।
 সর্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময় ॥
 সবার হইল আত্ম বিস্মৃতি অত্যন্ত ।
 কার দেখি কত ভাব নাহি তার অন্ত ॥
 প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস ।
 তাঁর দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এইরূপে গদাধর দাস রাধিকা, রঘুনাথ রেবতী এবং কৃষ্ণদাস গোপালভাবে বিহ্বল হইয়া উদ্গু নৃত্য করিতে করিতে গমন করিলেন । শ্রীমন্নিত্যানন্দের বাহুজ্ঞান রহিত, তিনি ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্রন্দন করিতেছেন, অজ্ঞানাবস্থায় ভুলিয়া কতদূর গমন করেন, আর সম্মুখে যাহাকে দেখেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, “ভাই! গঙ্গাতীরে কোন্‌পথে যাইব ?”

এইরূপে প্রেমে বিহ্বল হইয়া বহুসংখ্যক ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ গোড়দেশাভিমুখে গমন করিলেন । তাঁহাদের প্রত্যেক ভক্তের জীবন চরিত বর্ণন করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে । নিত্যানন্দের পারিষদগণ মধ্যে প্রধান ভক্ত বার জন, ইঁহারা “দ্বাদশগোপাল” বলিয়া বিখ্যাত । দ্বাপর ও কলির সম্বন্ধভেদে তাঁহাদের নাম ও বাসস্থান নিম্নলিখিত হইল ।

কলিয়ুগে	দ্বাপরে	বাসস্থান
শ্রীঅভিরাম	(শ্রীদাম)	কৃষ্ণনগর (হুগলী)
শ্রীসুন্দরানন্দ	(সুদাম)	মহেশপুর (নদীয়া)
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত	(বসুদাম)	কাঁচড়াপাড়া (হুগলী)
শ্রীগৌরীদাস	(সুবল)	অম্বিকা (কালনা)
শ্রীকমলাকর পিপলাই	(মহাবল)	আকলামহেশপুর (হুগলী)
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত	(সুবাহ)	সপ্তগ্রাম (হুগলী)
শ্রীমহেশ পণ্ডিত	(মহাবাহ)	পানপাড়া
শ্রীপুরুষোত্তম দাস	(শ্তোক কৃষ্ণ)	বোধখানা (যশোহর)
শ্রীপরমেশ্বর দাস	(দাম)	তরাআটপুর (হুগলী)
শ্রীকালিয়াকৃষ্ণ দাস	(লবঙ্গসখা)	বড়গাছি (নদীয়া)
শ্রীমুকুন্দ দত্ত	(মধু মঙ্গল)	আবসাইহাটী (কাটোয়া)
শ্রীশিশুকৃষ্ণ দাস	(ভদ্রসেন)	ডাইহাট (কাটোয়া)

এই দ্বাদশজন নিত্যানন্দের প্রধান ভক্তের বাসস্থান দ্বাদশ পাট বলিয়া প্রসিদ্ধ । ধার্মিক বৈষ্ণবগণ অত্যাপি তীর্থ ভ্রমণ ও বৈষ্ণবোৎসব উপলক্ষে উক্ত শ্রীপাট দর্শন করিতে যাইয়া থাকেন ।





ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

••♦♦••=••♦♦••

পানিহাটীতে গমন ।

“রাধাভাব, হরিভক্তি, জীবের নিস্তার ।

এই তিন বাঞ্ছা পূরাইতে অবতার ॥

নিত্যানন্দ পার্শ্বদগণ সহ নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া পথি-
নধ্যে প্রেমের বস্তার দেশ ভাসাইতে লাগিলেন। এবং অবশেষে চন্দ্রিশ
পরগণা জেলার অন্তঃপাতী গঙ্গার তীরবর্তী পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত
হইলেন। এই গ্রামে পরম সাধু রাঘব পণ্ডিতের বাস। নিত্যানন্দ
এখানে আসিয়াই পার্শ্বদগণসহ রাঘব-গৃহে গমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ
পথিক অবাচিত ভাবে স্মৃতিতল বারি পাইয়া যেক্রপ আনন্দিত হয়, ধর্ম-
প্রাণ রাঘব নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন।
রাঘব পরম যত্নে স্বগণ নিত্যানন্দকে পরিতোষ পূরক আহারাদি
করাইলেন। রাঘব-গৃহে কীর্তনের শ্রোত প্রবাহিত হইল। সেই স্মধুর
কীর্তন শুনিয়া সংসারক্লিষ্ট মানব স্মৃতিতল ও আশ্বাসিত হইল।

নিতাইটাদের আনন্দের সীমা নাই, বাহজ্ঞান রহিত, একবার মধুর স্বরে কীর্ত্তন গাইতেছেন, আর পদ্মচক্ষু দিয়া শত শত ধারা ছুটিতেছে, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ এ দৃশ্য জগতে অতুল্য। যে প্রকার সুগন্ধি পুষ্প কুটিলে মধুগোষ্ঠী ভ্রমরগণ ব্যাকুল হইয়া আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রকার নিতাইটাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব প্রভৃতি ভক্তগণ উদ্ভ্রান্ত চিত্তে একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল, ভক্তগণ মহোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল, নাস্তিক হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এবং নিতাইটাদিও সুযোগ বুঝিয়া কলির নূতন গায়ত্রী—

“হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,

হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥”

প্রচার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের অদ্ভুত নৃত্য ও মধুর কীর্ত্তন থামিল না, ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার অলৌকিক প্রেম ও অশ্রু কম্প, পুলকাদি সাত্বিক ভাব দর্শন করিয়া ভক্তগণ ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিল। তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইল, সেই ব্যক্তিই প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিল এবং যাহাকে আলিঙ্গন করিলেন সেই অমনি মূর্চ্চিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

“নাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।

সেই প্রেমে চলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দ এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম-বিহ্বল হইয়া এক খাটে গিয়া উপবেশন করিলেন। এবং পার্শ্বদগণকে অভিষেক করিতে

আজ্ঞা করিলেন । প্রভুর আদেশানুসারে রাঘব পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তগণ সহস্র সহস্র ঘট গঙ্গাজল আনিলেন এবং নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া নিত্যানন্দের শ্রীমন্তকে ঢালিতে লাগিলেন । অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে নিতাইচাঁদকে নূতন বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিলেন, এবং শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিলেন । গলদেশে চন্দন চর্চিত বনমালা হুলিতে লাগিল । রাঘব প্রফুল্লচিত্তে প্রভুর মন্তকোপরি হস্তধারণ করিলেন । নিত্যানন্দের শরীর হইতে দ্রুতবেগে বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল । চতুর্দিকে হরিনামের ধ্বনি উঠিল, গানিহাটী হরিনামে ডুবিয়া গেল ।

মূর্তিমান বিনয় ও ভক্তিধর্মরূপী শ্রীমন্নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া উঠিল, তাঁহাদের মায়া বন্ধন ছিন্ন হইল । নিতাইচাঁদের প্রেমের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল, জ্ঞাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিতে লাগিল । ভগবদ্ভক্ত-নীরদ-বারি যে প্রকার সকলেই সমভাবে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পরম দয়ালু নিত্যানন্দের প্রেমভক্তিও আপামর সাধারণ সকলেই প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল । এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর প্রভু হাসিয়া রাঘবকে লিলেন, “পণ্ডিত ! তুমি সত্ত্ব কদম্বের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমার লে দাও । আমি কদম্ব পুষ্প বড়ই ভালবাসি ।” কদম্ব পুষ্প সে সময় পওয়া অসম্ভব, তাই রাঘব বলিলেন, “প্রভু ! এখন ত কদম্ব পুষ্পের ব্যবস্থা নহে, আমি উহা কোথায় পাইব ?” নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “তোমার বাড়ীতে যাইয়া ভালরূপ অনুসন্ধান কর ।”

অতঃপর প্রভুর আদেশে রাঘব পণ্ডিত নিজ বাড়ীতে যাইয়া কদম্ব গাথুঁজিতে লাগিলেন । অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে কতি জম্বীর বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে । এই অসম্ভব

ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া রাঘব পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্মত হইলেন এবং নিত্যা-
নন্দ যে স্বয়ং ভগবান্ ইহাই মনে করিয়া পুলকিত হইলেন। অবশেষে
কদম্ব পুষ্পের মালা গাঁথিয়া পরমানন্দে নিত্যানন্দের গলদেশে পরাইয়া
দিলেন। ইতোমধ্যে অকস্মাৎ আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ঠিক
সেই সময় দমনক পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল।
নিতাই হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা বল দেখি এ কিসের গন্ধ অনুভব
করিতেছ ?” ভক্তগণ বলিলেন, “আমরা দমনক পুষ্পের গন্ধ অনুভব
করিতেছি।” তখন নিতাই বলিলেন, “এ মনোহর গন্ধ কোথা হইতে
আসিতেছে জান ?” ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।
নিত্যানন্দ বলিলেন “শ্রীচৈতন্যদেব আজি কীর্তন শুনিবার জন্য নীলাচল
পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার
শ্রীঅঙ্গের দমনক পুষ্পের মালার সুগন্ধে দিগ্ভ্রমল পূর্ণ হইয়াছে।” এ
কথা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু ভক্তির রাজ্যে
প্রবেশ করিলে এই সমস্ত অলৌকিক লীলার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে
পারে না। বস্তুতঃ ভক্তির রাজ্যে ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব বিকাশ দর্শন
করিতে বাহিরের লোকে সম্পূর্ণ অনধিকারী। তাই আমাদের সহৃদয়
পাঠক ! নিতাইচরিত পাঠ করিবার সময় ইহা ভক্তের চক্ষেই দেখিবেন।

নিত্যানন্দ বলিলেন, “ভক্তগণ ! মহাপ্রভু কীর্তন শুনিতে
আসিয়াছেন, পরমানন্দে কীর্তন কর। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যশোগানে
তোমাদের সর্ব্বশরীর প্রেমপূর্ণ হউক।” এই কথা বলিতে বলিতে
নিত্যানন্দ গভীর গর্জনে ‘হরি বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।
নিত্যানন্দের আদেশ পাইয়া ভক্তগণ পরমানন্দে কীর্তন আরম্ভ
করিলেন। নিত্যানন্দের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে ভক্তগণ অলৌকিক
প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

“নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমবৃষ্টি পাতে ।
 সবার হইল আনন্দ বিস্তৃতি দেহেতে ॥
 শুন শুন আরে তাই ! নিত্যানন্দ শান্ত ।
 যেখানে দিনেই সর্ব জগতেরে ভুক্তি ॥
 যে ভক্তি গোপাকাগণে কহে ভাগবতে ।
 নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দ এইভাবে তিনমাস কাল অবস্থান করিয়া পানিহাটীতে প্রেমের ঢেউ তুলিলেন । বহু চর পাপী ব্যক্তি পবিত্র হইল এবং তাঁহার অন্নগ্রাহে অনেক ভক্তই নূতন শক্তি লাভ করিয়া নব জীবন প্রাপ্ত ইলেন ।

“আপনে যেহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
 সেইমত করিলেন সর্ব ভক্তবৃন্দ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)





চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

অবধূতের অলঙ্কার ধারণ ।

“দরশন মাত্র সর্ব জীব মুক্ত হয় ।

নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময় ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে নিত্যানন্দের হৃদয়পদ্মে নব-
 ভাবের বিকাশ পাইল । ক্রমশঃ নিতাইর ভাবের পরিবর্তন হইতে
 লাগিল । তিনি নূতন লীলার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 এতদিন কঠোর সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া যে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব প্রকাশ
 করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এই নূতন লীলার অভিনয় করিয়া তাহারই
 পরিসমাপ্তি করিতে ইচ্ছা করিলেন । পরম যোগী নিত্যানন্দের মনে
 অলঙ্কার পরিবার ইচ্ছা উপস্থিত হইল । তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ।
 সংসারীকে ধর্মপথে নিতে হইবে, এটা সহজ ব্যাপার নহে, ইহা সন্ন্যাস-
 ধর্ম অবলম্বন করিলে চলিবে না, নিজে সংসারী না হইলে অপর

সংসারশ্রমীকে ভক্তিপথে নেওয়া যাইবে না, ইহাই মনে করিয়া দয়ালু নিতাই নূতন ধর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন । জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জগতের সকল লোকেই ভগবৎ-প্রেম লাভ করুক, ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা, কাজেই তিনি এই নূতন ধর্মের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন ।

কৌপীন, বহির্কাস যাহার পরিধেয়, দণ্ড-কমণ্ডলু যাহার সম্বল, তিনি আজ মনোহর বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে উদ্যত ! এ দৃশ্য জগতে অভূত । নিতাইচাঁদ হাতে স্বর্ণবলয়, অঙ্গুলিতে রত্ন-ধচিত অঙ্গুরীয়, ও কণ্ঠে রমণীয় হার ধারণ করিলেন । দুই কর্ণে মুক্তাধচিত কুণ্ডল ও পাদপদ্মে ধবলকান্তি রজত নুপুর শোভা পাইতে লাগিল । গলায় মল্লিকা, মালতী, যুথী প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের মালা ও ললাটে সুন্দর তিলক ধারণ করিলেন । শ্রীঅঙ্ক চন্দন চর্চিত হইল । নীল পট্টিবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং অস্ত্রকে পট্টিবস্ত্রের পাগ বান্ধিলেন । স্বর্ণ-জড়িত-প্রান্ত-লৌহদণ্ড শ্রীকরে ধারণ করিলেন । পার্শ্বদগণও সকলেই ঐরূপ মনোহর বসন ভূষণে সজ্জিত হইলেন । মহাপ্রভু বে প্রকার নাগর বেশে সজ্জিত হইয়া নবদ্বীপের প্রবল প্রতাপ চাঁদকাজীর দর্প ধর্ম করিতে ও প্রেমভক্তি প্রচার করিতে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দও সেই প্রকার ভুবনমোহন সাজে সজ্জিত হইয়া ভক্তগৃহে গমন করিতে উদ্যত হইলেন ।

বাল্যকাল হইতে যিনি কঠোর যোগ-ধর্মে অভ্যস্ত ; আজ তিনি হঠাৎ সেই যুনিধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সংসারাসক্ত বিষয়ভোগী মানবের ন্যায় শারীরিক শোভা সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত নূতন বসন ভূষণে সজ্জিত হইতেছেন এ দৃশ্য সাধারণ মানবের চক্ষে নিতান্তই বিবদূষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । কিন্তু ভগবানের এই লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্বেদ করা সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও ভক্তের নিকট কষ্টকর নহে ।

ভরসা করি ধর্মপ্রাণ ভক্তগণ ইহাকে নিত্যানন্দের লীলাচাতুর্য্যই মনে করিবেন । কারণ যিনি বিষয় ভোগে অনাসক্ত, ঐশ্বর্য্যে বীতম্প্রহ, উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ এবং নিন্দা বা প্রশংসাতে অবিচলিত তাঁহার পক্ষে সকলই সমান । অপিচ যাহারা ধর্মরাজ্যের অতি হেয়তম নিয়ন্তরে দণ্ডায়মান, তাহাদেরই বিষয় ভোগে পতনের সম্ভাবনা অধিক ; কিন্তু যাহারা ধর্মরাজ্যের অতি উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত তাঁহাদের কোন অবস্থাতেই পতনের সম্ভাবনা নাই । “তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ।” * সর্বভুক বহ্নির প্রায় দোষ তেজীয়ান পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না । বস্তুতঃ ভগবানের সৃষ্টি কৌশল এমনই অদ্ভুত যে একের পক্ষে যাহা বিষ, অপরের পক্ষে তাহাই অমৃতবৎ হইয়া থাকে । সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা অবশ্য কর্তব্য, সংসারীর পক্ষে তাহা একান্ত পরিত্যজ্য । সংসারাশ্রমীদিগকে ভক্তিপথের পথিক করিতে হইবে ইহাই নিত্যানন্দের প্রাণের ইচ্ছা ; কিন্তু যাহারা আজন্ম সুখের-ক্রোড়ে লালিত-পালিত, কঠোর আত্মসংযমে অনভ্যস্ত, তাহাদিগকে একবারেই নীরস জ্ঞানমার্গে লইয়া যাইয়া ধার্মিক করিতে চেষ্টা করা যে বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই পরম দয়ালু নিত্যানন্দ কলির জীবের মলিন দশা দূর করিবার নিমিত্ত দেশকালপাত্রানুসারে নূতন ধর্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন । গণসহ নিত্যানন্দ গঙ্গাतीরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তগণকে পবিত্র করিতে লাগিলেন ।

“তবে প্রভু সকল পার্শ্বদগণ মেলি ।

ভক্ত গৃহে গৃহে করে পর্যাটন কেলি ॥

* “ধর্মব্যতিক্রমোদৃষ্টে ঈশ্বরানাং সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥”

জাহুবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম ।
 সর্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥
 দরশন মাত্র সর্ব জীব মুক্ত হয় ।
 নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময় ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দের অলৌকিক রূপ ও দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া অত্যাচারী
 অধার্মিক পাষণ্ডগণ সকলেই নবজাবন লাভ করিল। তাহাদের মন
 নিশ্চল হইল, হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল। বস্তুতঃ নিত্যানন্দ
 ভক্তগণ মধ্যে যে শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত, সেরূপ
 ঐশীশক্তির কথা কুত্রাপি প্রতিগোচর হয় নাই। এ সম্বন্ধে চৈতন্য-
 ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

“যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্তন ।
 তথায় বিহ্বল হয় কত শত জন ॥
 গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে ।
 তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে ॥
 ছস্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া ।
 “মুঞিরে গোপাল” বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥
 হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে ।
 শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥
 “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ” বলি ।
 সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী ॥

এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন ।

বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥

গোপীভাবে বাহু নাহি গদাধর দাসে ।

নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দ এইরূপে প্রেমভক্তি প্রচার করিতে করিতে পার্শ্বদগণসহ এড়েদহে পরম সাধু গদাধর দাসের আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন । গদাধর পরম কৃষ্ণভক্ত । তিনি সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তাঁহার দেবালয়ে “বাল-গোপাল” নামক বিগ্রহ ছিলেন । তিনি সেই উপাশ্রয় দেবতার সেবার জন্ত গঙ্গায় জল আনিতে যাইতেন, পশ্চিমধ্যে জল লইয়া ফিরিবার সময় গোপীভাবে বিহ্বল হইয়া অমনি বলিতেন,—

“মস্তকে করিয়া গঙ্গা জলের কলস ।

নিরবধি ডাকেন “কে কিনিবে গোরস ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দ গদাধর-আশ্রয়ে শ্রীবালগোপাল মূর্তি দর্শন করিবামাত্র প্রেমাভিষ্ট হইলেন । আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি বিদ্যুৎবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মূর্তিকে আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন । ভক্তগণ এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ভক্তিভরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । পরম ভাগবত মাধবানন্দ ঘোষ স্মরণীয় বুদ্ধিমান স্মরণ্য স্বরে “দানধনু” গাইতে লাগিলেন । মাধবের মধুর কীর্তন শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রেমাভিষ্ট

হইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে প্রেম-ভক্তি প্রকাশক সাত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল।

“ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।

শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি ॥

স্মৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।

দানখণ্ড নৃত্য প্রভু করে নিজরঙ্গে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

গদাধরের বাসগ্রামে একজন দুর্কৃত্ত কাজি রাজকার্য্য করিতেন। মুসলমানগণ স্বভাবতঃ হিন্দুধর্ম্ম ঘেঁষী, তাহার উপর আবার ইহার সংকীর্ণনের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ছিল, কাজেই তাঁহার ভয়ে প্রকাশে কেহ সংকীর্ণন করিতে পারিত না। কিন্তু একদিন রাত্রিতে প্রেমাবিষ্ট গদাধর হরিধ্বনি করিতে করিতে কাজির গৃহে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধরের এই অপূর্ব ভাব দর্শন করিয়া কাজির কর্ম্মচারিগণ কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইল না, সকলেই চুপ করিয়া থাকিল।

এদিকে গদাধর উদ্ভ্রান্তভাবে একেবারে কাজীর সম্মুখে বাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভীতি ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, “আরে বেটা শীঘ্র কৃষ্ণ বল, নতুবা এখনই তোঁর মস্তক ছেদন করিব।” কাজি এই প্রকার কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু গদাধরকে দেখিবামাত্র মন্ত্রোষধি-কুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় তুষ্টীভাব অবলম্বন করিলেন। তখন কাজি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “গদাধর! তুমি এখানে কেন?” গদাধর বলিলেন, “আমার কিছু কথা আছে, তুমি শুন। গৌর নিতাই দুই ভাই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতবাসীকে হরিনাম লওয়াইতেছেন; জগতের আবাল-

বুদ্ধ-বনিতা সকলেই নামস্মৃধা পান করিয়া কৃতার্থ হইল, আর তুমি এখনও পড়িয়া রহিলে? আজ আমি তোমাকে সেই হরিণাম বলাইতে এখানে আসিলাম । বল বল শ্রবণ মঙ্গল মধুর হরিণাম একবার বল, তোমার সকল পাপ দূরে যাইবে ।” যদিও কাজি অত্যন্ত হুঁচুচু ও হরিণামের চির বিরোধী, কিন্তু না জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে আজ গদাধরের মুখে এই প্রকার অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়াও মৌনভাবে অবস্থান করিলেন । ক্ষণকাল পরে কাজি সহাস্যে বলিলেন, “গদাধর! অত্যাচার মত তুমি গৃহে গমন কর, কাল আমি হরি বলিব ।”

এই কথা শুনিয়া, “আর কাল কেন? এই তো তুমি হরি বলিলে, তোমার সমস্ত পাপ আজ দূর হইল।” ইহাই বলিয়া গদাধর আনন্দে হাতে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে গমন করিলেন । যে কাজি হরিণামের চির বিরোধী, হিন্দুদের জাতি ধ্বংস করাই যাহার স্বভাব, যাহার অত্যাচারে হিন্দুগণ সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন, আজ সেই দুর্বৃত্ত কাজীর প্রবল প্রতাপ ও অমুচিত ঔদ্ধত্য নিত্যানন্দ ভক্তের নিকট থর্ব হইল । কাজি আত্ম দৃষ্টি লাভ করিয়া পরম সাধুরূপে পরিগণিত হইলেন । নিত্যানন্দ এইরূপে এড়েন্দ্রে ভক্তগণকে প্রেমভক্তি দান করিয়া খড়দহে গমন করিলেন, তথায় আসিয়া প্রধান ভক্ত চৈতন্যদাস ও পুরন্দর পণ্ডিতের আশ্রয়ে কয়েক দিন বাস করিলেন ।

নিত্যানন্দের শুভ আগমনে খড়দহ পবিত্র হইল, প্রেম তরঙ্গ উথিত হইল, জীবের মলিনভাব দূর হইল । প্রভুর অল্পপম সৌন্দর্য্য, অলৌকিক সাম্বিকভাব, ও অসাধারণ জীবাত্মকম্পা দর্শন করিয়া লোকে চমকিত হইল এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল ।



পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

—:—

উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে ।

“তেষাং যোগাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহং ॥”

(গীতা ।)

অতঃপর নিত্যানন্দ গণসহ অতি ব্যাকুল হৃদয়ে খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সপ্তগ্রাম হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মুক্তবেণী স্থান অর্থাৎ পরম পবিত্র প্রধান তীর্থ ত্রিবেণীর তীরে অবস্থিত। এই সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের মহা অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্শ্বদ ভক্ত শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তের বাস। ইনি বৈষ্ণৱ জাতীয় সুবর্ণ বণিক বংশসম্ভূত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীকরচন্দ্র দত্তের ঔরসে ও শ্রীমতী ভদ্রাবতীর গর্ভে ১৪০৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারে দ্বাদশগোপালের মধ্যে সুবাহু নামক পঞ্চম গোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ অবতারে শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামে শ্রীমদ্বিত্যানন্দের প্রধান ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। ইহার সম্বন্ধে প্রাচীন পদকর্তার একটা সুন্দর পদ উল্লেখ করা যাইতেছে ।

শ্রীকর নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ,
ভদ্রাবতী গর্ভজাত ।

ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,
শ্রীগোবিন্দ পদাশ্রিত ॥

শାନ୍ତିଲା ପ୍ରବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ୍ତ ଦୀର,
 ସୁବର୍ଣ ବନିକ ଧ୍ୟାତି ।

রাধাকৃষ্ণ পদ, ধ্যায় নিরন্তর,
বৈশ্যকলেতে উৎপত্তি ॥

বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য,
মলপ্রায় ত্যাগ করি।

পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে,
হইলা বিবেকাচারী ॥

নীলাচলপুরে, প্রভু ধরিবারে,
সদা ইতি উতি ধায় ।

আশাবুলি ল'য়ে, ভিখারী হইয়ে,
প্রসাদ মাগিয়া খায় ॥

প্রভু ভক্তগণ, পাই নিজ জন,
রাখিয়া যতন করি ।

এ দাস মুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ,
দত্তের দৈন্যতা হেঁরি ॥”

(પદ સમૂહ ।)

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে । আসিয়া কলিকলুষ নাশিনী নির্মল
 সলিলা ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তের গৃহে পদার্পণ
 করিলেন । নিত্যানন্দকে দর্শনমাত্রে ভক্ত উদ্ধারণের ভক্তি-মন্দাকিনী
 শতধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল । তিনি আনন্দে অধীর হইয়া
 পড়িলেন । বিরহ-বিধুরা-পতিপ্রাণা কুলকামিনী বহুদিন পরে বিদেশা-
 বস্থিত স্বীয় প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দলাভ করেন, ভক্ত
 উদ্ধারণ অনেক দিনের পর নিজ প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া ততোধিক
 আনন্দানুভব করিলেন । ভক্ত হৃদয় যে কিরূপ পদার্থ তাহা বর্ণন করা
 মাদৃশ অধম ব্যক্তির সামান্য লেখনীর কার্য্য নহে । বস্তুতঃ প্রেমিক
 ব্যক্তিরই ইহা অনুভবের বস্তু । যাহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের কণা-
 মাত্রও বিদ্যমান আছে, তিনিই ইহার আনন্দময় সত্তা অনুভব করিতে
 সমর্থ ; কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগ্য নহে । যাহা হউক
 ভগবৎ প্রেমের উচ্ছ্বাস জাত এই আত্মবিস্মৃতি সাধারণের চক্ষে
 কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও ভক্তগণের নিকট ইহা ঐশী শক্তির
 অপূর্ণ বিকাশ বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে । নিত্যানন্দগত জীবন
 উদ্ধারণ দত্ত অকৈতবে কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন ।
 প্রভুও তাঁহার সেবায় পরম তৃপ্ত হইলেন ।

“কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ ।

ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার ।

পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য আর ॥”

(চৈতন্ত ভাগবত ।)

উদ্ধারণ-গৃহে প্রেমের জোয়ার আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ কীর্তন তরঙ্গে সমস্ত সপ্তগ্রাম ভাসিয়া গেল। দলে দলে লোক আসিয়া প্রভুর ভক্ত হইতে লাগিল। দয়ালু নিতাইর ভুবনমোহন রূপ, প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্তি ও নিঃস্বার্থ দয়া যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল, সে মনে করিল এ দৃশ্যটি বুঝি মর্ত্যের নহে! স্বয়ং ভগবান বিশ্বাসে সকলেই তাঁহাকে প্রাণ, মন, বুদ্ধি অর্পণ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। দয়ালু নিতাইর এই প্রকার বিশ্বজনীন প্রেমে বণিগ্‌বংশ উদ্ধার হইল এবং সেই হইতে সপ্তগ্রাম একটি প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইল। সপ্তগ্রামের মুখ, বিদ্যান, ধনা, নিধন, ধার্মিক, অধার্মিক, পাষণ্ড, প্রেমিক সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

“নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।

হেন নাহি যে বিশ্বল না হয় জগতে ॥

অন্তের কি দায় বিমুগ্‌দ্রোহী যে যবন।

তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥

যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।

ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিকার ॥”

(চৈতন্য ভাগবত।)

এখানে প্রসঙ্গাধীন আরও একটি কথা বলা যাইতেছে। ভগবান্ ভক্তের প্রতি কিরূপ ভালবাসা দেখাইয়া থাকেন, উদ্ধারণ দত্তের জীবনে তাহার অপূৰ্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ উদ্ধারণ দত্ত ভক্তির জোরে নিত্যানন্দের এতদূর প্রিয় হইয়াছিলেন যে, এমন কি তিনি সময়ে সময়ে নিজ হস্তে রক্তনাদি করিয়াও প্রভুর সেবা করাইতেন।

যদিও সংসারাশ্রমীর নিকট এ দৃশ্য বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির রাজ্যে তাহা গ্রহণীয় নহে। কারণ নিত্যানন্দ স্বয়ং ঐশী-শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ; কাজেই তাঁহার পক্ষে এ কার্য অযৌক্তিক নহে। কৰ্ম্ম জীবনে যাহারা ধৰ্ম্মরাজ্যের অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিত, তাঁহাদের পক্ষেই জাতিগত বৈষম্য বিচার্য্য ; কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে তাহা সমীচীন নহে। উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ বণিক্ জাতীয় * হইলেও পরম বৈষ্ণব ও নিত্যানন্দে তদন্ত প্রাণ ছিলেন। তজ্জগৎ দয়াল নিতাই তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ভগবান ভক্তের অধীন, ইহা ঐব সত্য। এমন কি স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

“তেষাং যোগাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥”

(গীতা ।)

যাহারা অনগ্রাকৃষ্ট চিত্তে আমাতে আত্ম সমর্পণ করে, আমি তাহাদের সমুদয়ই নিজে বহন করিয়া থাকেন। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবদগীতায় যাহার অভিব্যক্তি, শ্রীমদ্বিত্যানন্দের চরিত্রে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই কথা বলিয়া যাহারা নিত্যানন্দের পবিত্র জীবনে দোষারোপ করেন, তাহারা যে নিতান্তই ভ্রান্ত ও বিবেক-হীন শূণ্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

“একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া ।

হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে সুধায়া ॥

শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন ।

স্বপাক করয়ে কিন্ম আছয়ে ত্রাঙ্গণ ॥

* সুবর্ণ বণিক্ জাতির বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি ।
 না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি ॥
 এইমত পরিবর্তরূপে পাক হয় ।
 শুনিয়া সবার মনে হইল বিস্ময় ।
 তারা কহে এ বৈমগ্ধ হয় কোন জাতি ।
 পূর্ববাক্যে কোন্ নাম কোথায় বসতি ॥

“ধেনুঃ স্বর্ণময়ীং যন্তে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ ।
 তস্যাশ্চ খেনোস্ছেদেন পতিতা বণিজঃ কলৌ ॥
 ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ ।
 বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্ঞাতাঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥”

(কুলরমার বচন ।)

বঙ্গবাসী বণিকগণ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত ; কিন্তু স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকার (সেকরা) গণ অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন । স্বর্ণবণিকগণের জল অস্পৃশ্য হওয়া সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে, এক সময় মহারাজ বল্লালসেনের মাতৃশ্রাদ্ধে সুবর্ণ নির্মিত কতকগুলি ধেনুদান হয়, ঐ সকল ধেনু যে সকল স্বর্ণবণিক দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে, ঐ সকল ধেনু শূদ্রগর্ভ, এবং উহাদের অন্তরে অলঙ্কার রক্ষিত হইয়াছে । তৎপর জনৈক বিপ্র রাজদত্ত একটি স্বর্ণগাভী এক সুবর্ণবণিকের নিকট বিক্রয় করেন । পরে বণিক ঐ স্বর্ণধেনু ছেদন করিলে উহার ভিতর হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতে থাকে । ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ উর্দ্ধ্বাশ্রমে যাইয়া মহারাজ সমীপে আনুপূর্বিক বিবরণ জানাইলেন, এবং বলিলেন যে, “মহারাজ ! আমার সাক্ষাতে ঐ বণিক আপনার রাজ্যে গোবধ করিয়াছে ।” ইহা শুনিয়া মহারাজ সেই বণিকের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । বলিলেন যে, “ঐ গাভীর জন্ত আমাকে যে প্রকার খিদ্যমান হইতে হইল, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে যে রূপ মনস্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হইবে । আমার অধিকার মধ্যে যেখানে যত স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকার আছে, তৎসমস্তকে অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজসভার আদেশানুসারে অস্পৃশ্য করা গেল ।” তদবধি ইহারা সেই ভাবেই আছেন ।

প্রভু কহে ‘ত্রিবেণীতে’ বসতি উহার ।

সুবর্ণ বণিক দেখি করিষু স্বীকার ॥

এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল ।

ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল ॥”

(নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ।)





ষষ্ঠবিংশ অধ্যায় ।

অদ্বৈত আলায়ে গমন ।



“দৌহে দৌহা দেখি বড় হইল বিবশ ।

জন্মিল অনন্ত অনির্বচনীয় রস ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

অতঃপর শ্রীমদ্বিত্যনন্দ সপ্তগ্রাম হইতে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে উপস্থিত হইলেন । পরমভক্ত উদ্ধারণ দত্ত ও অগাধ্য ভক্তবৃন্দও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন । বহুকাল পরে শ্রীঅদ্বৈত দ্বিত্যনন্দকে দেখিয়া আনন্দে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন । এবং দয়ালু নিতাইকে প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন । তারপর উভয়ে কোলাকুলি করিলেন, প্রেমাশ্রুতে উভয়ের বক্ষঃ ভাসিয়া গেল । নিতাই চাঁদ অঝোর নয়নে রুরিতে লাগিলেন । তাঁহার নয়ন পদ্ম হইতে টস্ টস্ করিয়া ধারা বহির্গত হইতে লাগিল, উভয়ের শরীরে প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্তির বিকাশ পাইল । দুইজনেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন । বস্তুতঃ বিরহের পর মিলনের যে কি সুখ তাহা অবর্ণনীয় ।

এই বিরহ জনিত দুঃখের ও মিলন জনিত সুখের যে অবস্থা তাহা বঙ্গীয় কাব্য কাননের পিকরাজ বিদ্যাপতি মাধুর্য্যময়ী ভাষাতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রসঙ্গাধীন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার অদমনীয় লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ।

“হিমকর কিরণে, নলিনী যদি জারব,
কি করিব মাধবী মাসে ॥

অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করিব বারিদ মেহে ।

হরি হরি কোইহ দিব দুর্শাশা ।

সিদ্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কোদূর করব পিয়াসা ॥

চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি ।

চিত্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগী ॥

শ্রাবণ মাহে ঘন বিন্দু না বরিখব,
সুরবত বাঁঝকি ছান্দে ॥”

কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা রাধিকা আবেগভরে বলিতেছেন, “চন্দ্রকরে নলিনী লতা শুকাইয়া গেলে, বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে? তপন তাপে অঙ্কুর জলিয়া গেলে, বর্ষার জলে কি করিবে? হরি হরি এ কি দৈব দুঃখ! সিদ্ধুতীরে যদি কণ্ঠ শুকায়, তবে আর পিয়াসা কে

দূর করিবে ? আমার কৰ্ম্মদোষ ভিন্ন চন্দন তরু সৌরভ বিচ্যুত হইবে কেন ? চন্দ্রকর হইতে অগ্নিকণা লাভ করিব কেন ? এবং চিন্তামণি স্বর্ণ হারা হইবে কেন ? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না, এবং কল্পতরু আমার পক্ষে বন্ধ্য হইল ।” কিন্তু সেই বিরহিনী প্রেম পাগলিনী রাধিকা যখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়-সরোবরে নূতন ওাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইল । তখন শ্রীমতী রাধিকা আবেগভরে বলিতে লাগিলেন ;—

মোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা ।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ ইউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥”

“সেই কোকিল এখন লক্ষ লক্ষ ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদিত হউক, পাঁচটা ফুলবাণের স্থলে লক্ষ বাণ নিক্ষিপ্ত হউক, ব্রহ্মন্দ মলয় পবন এখন ঘন ঘন প্রবাহিত হউক।”

বস্তুতঃ কবি বিদ্যাপতি অমৃত নিঃশুন্দিনী ভাষায় বিরহ ও মিলনের
যে মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সাহিত্য জগতের অপূৰ্ণ ছবি।
সাধারণ পাঠক ইহাতে কবিত্বের অপূৰ্ণ বিকাশ দর্শন করিয়া তৃপ্ত
হইবেন ; কিন্তু চিন্তাশীল ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণ ইহাতে ভগবৎ-প্রেমের
অপূৰ্ণ স্ফুৰ্ত্তি উপলব্ধি করিয়া বিমল সুখ অনুভব করিবেন।

প্রিয় পাঠক! মনে করিবেন, এ ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ ও অষ্টদেবের সেই অবস্থা হইয়াছে। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর উভয়ে একত্র হইয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই ভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে আসঙ্গলিপায় ব্যাকুল হইয়া উভয়ে উভয়ে প্রেমালিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

“দৌহে দৌহা দেখি বড় হইল বিবশ ।
 জন্মিল অনন্ত অনির্বচনীয় রস ॥
 দৌহে দৌহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে ।
 দৌহে চাহি ধরিবারে দৌহার চরণে ॥
 কোটী সিংহ জিনি দৌহে করে সিংহনাদ ;
 সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ ॥”

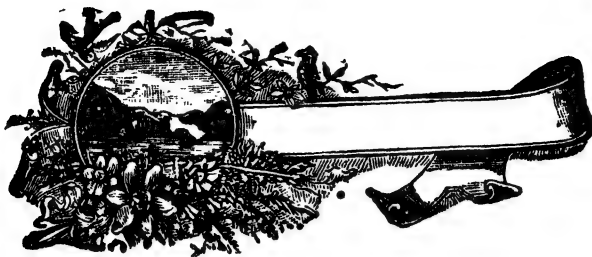
(চৈতন্য ভাগবত ।)

কিছুকাল পরে উভয়ে স্থির হইলেন । তখন শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে
 স্তুতি করিতে লাগিলেন ।

“তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দনাম ।
 মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥
 সর্ব জীব পরিত্রাণ তুমি মহা হেতু ।
 মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্ম সেতু ॥
 তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেম ভক্তি ।
 তুমি সে চৈতন্যের নক্ষত্র ধর পূর্ণ শক্তি ॥
 ব্রহ্মা শিব নারদাদি ভক্ত নাম যার ।
 তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥
 বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা হৈতে ।
 তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥
 পতিত পাবন তুমি দোষ দৃষ্টি শূন্য ।
 তোমারে সে জানে যার আছে বলপুণ্য ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এইরূপে দুই প্রভু কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে তিন চারি দিবস অতিবাহিত
 করিলেন । তৎপর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের নিকট হইতে বিদায়
 গ্রহণ করিয়া শচীমাতাকে দেখিবার নিমিত্ত নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা
 করিলেন ।



সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

—o—o—o—o—o—o—

শূন্য নদীয়ায় নিতাইচাঁদ ।

“আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবেন এক ঠাঁই ।

নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই ॥”

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন । এদিকে নবদ্বীপের অবস্থা তখন কি প্রকার, তাহা দীনা ভাষায় বর্ণন করিবার শক্তি নাই । মনোহর পূর্ণচন্দ্রের অভাবে ধরিত্রী যে প্রকার গাঢ় অন্ধকারারত হইয়া মলিনভাব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার ত্রীগোরাঙ্গের অভাবেও নদীয়া নগরী বিষাদ কালিমাতে আবৃত হইয়াছে । নদীয়াবাসীর সে সুখ নাই, সে শান্তি নাই, যেন সকলেই জীবন্ত বৎ মর্ষবেদনার স্রোতে গা

ঢালিয়া দিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। শচীমাতা পুত্র বিরহে পাগলিনী
প্রায় হইয়াছেন, সমগ্র নদীয়াবাসী, নদীয়াবাসী কেন সমগ্র জগৎ
যে ছেলেটির রূপ, গুণ ও অলৌকিক লীলাচাতুর্য্য দর্শনে মুগ্ধ
হইয়াছে, এ হেন পুত্রের বিরহে স্নেহশীলা মাতার হৃদয়ে কিরূপ
দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা—অনুমান করাই
সহজ। শ্রীগোরাঙ্গের মুখচন্দ্র যখনই তাঁহার মনে পড়ে, তখনই
তিনি শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়েন অমনি যেন ভাবের ঘোরে
বলিতে থাকেন—

“আর না হেরিব, প্রসর কপালে,

অলকা তিলক কাচ ।

আর না হেরিব, সোণার কমলে,

নয়ন খঞ্জন নাচ ॥

আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে,

সকল ভক্ত লয়ে ।

আর না নাচিবে, আপনার ঘরে,

আর না দেখিব চেয়ে ॥

আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই,

নাচিবেন একটাই ।

নিমাই বলিয়া, ফুকরি সদাই,

নিমাই কোথাও নাই ॥”

পাঠক ! অত্ৰ দিকে বিরহবিধুরা গোরাঙ্গগতপ্রাণা শ্রীমতী বিষ্ণু
প্রিয়ার অবস্থা আর কি বর্ণন করিব ? এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি
প্রেমদাস লিখিয়াছেন—

“যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া ।
 তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
 দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম স্মৃধা খানি ।
 কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী ॥
 বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে ।
 দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥
 হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী ।
 গৌরাজ বিরহে কান্দে দিবস রজনী ॥
 প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথা ।
 প্রেম দাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা ॥”

শচী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষাদসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, ভক্তগণ সকলেই মহাপ্রভুর বিরহে ত্রিয়মাণ, নদীয়া নগরীতে নিরানন্দের ধারা প্রবলবেগে বহমান, এইরূপ সময়ে নিতাইচাঁদ শূন্য নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন ।

ভক্তগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । নবদ্বীপে পুনরায় স্মৃথের জোয়ার প্রবাহিত হইল । নিত্যানন্দ আসিয়া অগ্রে শচীমাতাকে প্রণাম করিলেন । শচীমাতাও বহুদিনের পরে হারানিধি পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন । তখন স্নেহভরে নিত্যানন্দকে বলিলেন “বাপ নিতাই ! তুমি সর্ব অন্তর্যামী, আমি ইতঃপূর্বেই তোমাকে দেখার ইচ্ছা করিয়াছি, আমার মনের ভাব জানিয়াই তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ । তোমাকে দেখিয়া আমার মানসিক কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে, তুমি কিছু দিন এখানে থাক ।”

আইবলে “বাপ তুমি সর্ব অস্তর্যামী ।
 তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি ॥
 মোর চিত্ত জানি তুমি আইলে সহর ।
 কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিত্তর ॥
 কতদিন থাক বাপ ! এই নবদ্বীপে ।
 যেন তোমা দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

শচীমাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন ।

—“শুন আই সর্বমাতা ।

তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা ॥
 মোর বড়ই ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায় ।
 রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আশ্রয়ে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিতাইটাদ এই প্রকারে শচীমাতাকে সম্ভাষণ করিয়া ছুটিচিতে নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । পুনরায় নবদ্বীপে কীর্ত্তন তরঙ্গ ছুটিল, ভক্তগণ বহুদিনের পর হরি নামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । প্রেমের বন্যায় নদীয়া নগরী ডুবিয়া গেল । নিত্যানন্দ কীর্ত্তনের প্রধান নায়ক হইলেন । তাঁহার বিকশিত কদম্ব পুষ্পের জায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-সিক্ত পদ্ম পত্রের জায় প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়ন ফুল ও অপূর্ব নাগর বেশ দর্শন করিয়া বহুতর পাপী পবিত্র হইল, অনেক কঠিন হৃদয় সরস হইল এবং ভক্ত হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল ।



অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

চোর দস্যুর উদ্ধার ।

“কৃষ্ণা পাপং হি সমুপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ।

নৈবং কুর্য্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥”

ইহার পর নিত্যানন্দ এক নূতন লীলার অভিনয় করিলেন । নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ কুমার বাস করিতেন । চৌর্য্যবৃত্তিই ইহার জীবনোপায় ছিল । নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি যত পাপকার্য্য আছে, কিছুই ইহার অকরণীয় ছিল না । ইহার অধীনে বহুসংখ্যক চোর ছিল, সকলের উপর ইনিই কর্তৃত্ব করিতেন । নিত্যানন্দের অঙ্গে নানাপ্রকার মূল্যবান অলঙ্কার দর্শন করিয়া তৎপ্রতি তাহার অদমনীয় লোভ উপস্থিত হইল । ব্রাহ্মণ তনয় সেই প্রলোভন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না । কি উপায়ে এই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে শুধু তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষে একদিন তাহার দলস্থ লোককে ডাকিয়া বলিলেন, “আরে ভাই ! আর আমরা বৃথা কষ্ট করি কেন ? চণ্ডী মাতার অমুগ্রহে আমাদের একটি মহা সন্যোগ উপস্থিত হইয়াছে ।

সম্প্রতি এখানে যে একটি অবধূত আসিয়াছে, তাহার শরীরে মণিমুক্তা-জড়িত মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার যথেষ্ট আছে, সে হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে বাস করে, চল আমরা যাইয়া তাহার গায়ের সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইয়া আসি। ঢাল, খাঁড়া লইয়া সকলে একত্র হও। আজ রাত্রিতে সেখানে যাইব।”

“আরে ভাই ! সবে আর কেন দুঃখ পাই।

চণ্ডীমারে নিধি মিলাইলা এক ঠাঁই ॥

এই অবধূতের দেহেতে অলঙ্কার।

সোণা মুক্তা হীরা কসা বই নাই আর ॥

কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।

চণ্ডীমারে এক ঠাঁই মিলাইলা আনি ॥

শূণ্য বাড়ীখানে থাকে হিরণ্যের ঘরে

কাড়িয়া আনিব সব দণ্ডের ভিতরে ॥

ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।

আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এইরূপ যুক্তি করিয়া দস্যুগণ ঢাল, তরবারি, ত্রিশূল প্রভৃতি শস্ত্র লইয়া হিরণ্য পণ্ডিতের আলয়াভিমুখে রওনা হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সকলে একত্র হইল, এবং একজন চর হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। চর যাইয়া দেখিল, সকলেই জাগ্রত, নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করিতেছেন, ভক্তগণ কীর্তন করিতেছেন, কেহ করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন, কেহ আনন্দে বিভোর হইয়া হাসিতেছেন। চর

আসিয়া দস্যুগণের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল । দস্যুগণ বলিল,
“সকলে শয়ন করুক, তারপর আমরা যাইয়া হানা দিব ।”

চোরগণ তখন সকলে একত্র বসিয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত
করিতে লাগিল ।

“কেহ বলে, “মোহর সোণার তার বালা ।”

কেহ বলে, “মুঞি নিমু মুকুতার মালা ॥”

কেহ বলে, “মুঞি নিমু কর্ণ আভরণ ।”

স্বর্ণহার নিমু মুঞি বলে কোন জন ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রমে রজনী অধিক হইল, নিদ্রাদেবী
আসিয়া দস্যুগণের হৃদয় অধিকার করিলেন, চোরগণ শুইয়া পড়িল ।
নিতাইচাঁদের এমনি অদ্ভুত লীলা যে তাহারা এতদূর গভীর নিদ্রায়
নিমগ্ন হইল যে সে রাত্রে আর কেহ জাগরিত হইল না । ক্রমশঃ রজনী
প্রভাত হইল, পক্ষিগণ প্রাভাতিক সঙ্গীত গান করিতে লাগিল, প্রাতঃ-
সূর্য্যের হৈম প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হইল, কিন্তু চোর দস্যুগণের ঘুম
ভাঙ্গিল না । অবশেষে দিবাকরের শিশিরসিক্ত কিরণজাল যখন ক্রমশঃ
তীক্ষ্ণভাব ধারণ করিতে লাগিল এবং কাকের কঠোর রবে দিগ্বাণুল
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তখন চোরগণ রাত্রি ভোর হইয়াছে দেখিয়া
অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় রাখিয়া ব্যাকুল চিন্তে চারিদিকে পলায়ন করিল । তার
পর সকলে গঙ্গান্নান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল ; এবং সকলেই
সকলকে ভৎসনা করিতে লাগিল ।

“কেহ বলে, “তুই আগে পড়িলি শুইয়া ।”

কেহ বলে, “তুই বড় আছিলি জাগিয়া ॥”

কেহ বলে, “কলহ করহ কেনে আর ।

লজ্জা ধর্ম চণ্ডী আজি রাখিলা সবার ॥”

(চৈতন্য ভাগবত :)

তখন দস্যুপতি ব্রাহ্মণ কুমার বলিল, “কেন তোমরা বৃথা কলহ করিতেছ ? একদিন বিফল মনোরথ হইয়াছি বলিয়া কি প্রতিদিনই বিফল কাম হইব ? গত কল্য চণ্ডী মাতার পূজা করি নাই, সুখিলাম তিনি আমাদের প্রতি অপ্রসন্না হইয়াছেন, তজ্জগুই আমরা এইরূপ ফল পাইয়াছি । চল আজ ভাল করিয়া মদ্য মাংস দিয়া চণ্ডী মাতার পূজা করি গে ।”

“ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া ।

চল সবে এক ঠাই চণ্ডী পূজি গিয়া ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই যুক্তি করিয়া সকলে মদ্য মাংস দ্বারা চণ্ডী মাতার পূজা করিল, এবং গভীর রজনীতে দস্যুগণ সকলে নীল বস্ত্র পরিধান করিয়া হিরণ্য মারের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল । বাড়ীর নিকটবর্তী হইবা মাত্র তাহারা যে অভূতপূর্ব দর্শন করিল, তাহাতে দস্যুগণ সকলেই একেবারে কিংকর্তব্য-মুঢ় হইয়া পড়িল । এককাল যাবৎ দস্যুগণ করিতেছে ; কিন্তু এরূপ তাহাদের নেত্রপথে কখনও পতিত হয় নাই । তাহারা দেখিল যে বাড়ীর চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরিগণ নিরন্তর হরিধ্বনি করিতেছে, তাহাদের প্রকাণ্ড শরীর, গলায় মালা, সর্বাঙ্গ চন্দন লিপ্ত । এই অভূত-পূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল ।

“বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে ।

চতুর্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥

চতুর্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ ।

নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তখন দস্যুগণ মধ্যে এক একজন এক এক কথা বলিতে লাগিল । কেহ বলিল, “আরে ভাই ! অবধূত কোথা হইতে এই সকল পদাতিক আনিল ? কেহ বলিল, অবধূত অত্যন্ত জ্ঞানী বোধহয় ভাবী অবস্থা জানিয়া আত্মরক্ষা করার জন্তই এই সকল পদাতিক রাখিয়াছে । অপর এক জন বলিল, “যে ভাল খায়, ভাল পরে, তাহার আবার ধর্মভাব কি আছে ? ঐ সব ছলনা মাত্র ।” অবশেষে দস্যুপতি ব্রাহ্মণ কুমার বলিল, “আরে ভাই ! তোমরা বৃথা ভীত হইতেছ, ও সব কিছুই নহে, চতুর্দিক হইতে অনেক বড় লোক অবধূতকে দেখিতে আসিয়াছে, ইহারা তাহাদের পাইক । আজ আর আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটিল না । চল যাই, কয়েক দিন পরে পুনরায় আসিব ।” এইরূপ যুক্তি করিয়া দস্যুগণ প্রত্যাগমন করিল । অতঃপর আর একদিন পুনরায় সকলে মিলিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহ নিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে চুরি করিতে আসিল । ক্রমে সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল । কিন্তু ভগবানের কি অদ্ভুত কৌশল ! আজ আবার তাহাদের একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হইল । বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্রই তাহাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল, সকলেই অন্ধ, কেহ কিছুই দেখিতে পায় না, চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ । তখন দস্যুগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল । কেহ গড়খাইর ভিতর পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ বা জোক

পোকের কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল । কেহ কেহ কাঁটার ভিতর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা খালের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু থাইতে লাগিল ।

এই সময় অকস্মাৎ আঃও একটি আধিদৈবিক উপদ্রব উপস্থিত হইল । প্রবলবেগে ঝড় ও ঊৎপাতিক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, দারুণ শীতে সকলে কাঁপিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বজ্রপাত হইতে লাগিল । দম্ভ্যগণ এই প্রকার দৈব দুর্ভিক্ষপাকে পতিত হইয়া দুর্ভিক্ষ সহ দুঃখ ও বিড়ম্বনা ভোগ করিল । এইরূপ বিপদ হইয়া দম্ভ্যদলপতির মনে হঠাৎ একটি নূতন ভাবের উদয় হইল । সে ভাবিল ;—“নিত্যানন্দ মানুষ নহে, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।” এই মনে করিয়া দারুণ দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, চোরপতির কঠিন হৃদয় অমৃতাপানলে গলিয়া গেল । অবশেষে দয়াল নিতাই চরণ ধরিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিল ।

“কতক্ষণে দম্ভ্য সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ ।

অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥

মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে ।

সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্যে সত্য কহে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

সঙ্গিগণও দলপতির কাতোরুক্তি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, নিত্যানন্দ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । তখন সকলেই সন্দিহান চিত্তে নিত্যানন্দ প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিল । নিতাইচাঁদ পরম দয়ালু, তাঁহার দয়ার দ্বার অব্যাহত । তিনি কি আর এই পাপিগণের ছুরবস্থা দর্শন করিতে পারেন? কিছুতেই যার স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল ?

রূপাবারি বিতরণ করিলেন। অমনি দস্যুদলপতি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিল। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার বিমল জ্যোতির্দর্শন করিল। নিত্যানন্দের অঙ্গ স্পর্শমাত্র প্রেমভক্তি লাভ করিল, তাহার পাপ কলুষিত হৃদয়ে নিশ্চল জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশ পাইল। তখন চোরপতি নিত্যানন্দের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্তিভরে স্তুতি করিতে লাগিল।

“রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল !

রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব জীব পাল !

যে জন আছাড় প্রভু ! পৃথিবীতে খায়।

পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥

এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।

শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে তরে ॥

তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ।

পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ ॥

তথাপি যদিপি আমি ব্রহ্মন্ন গোবধী।

মোর বাড়ি আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥

সর্ব মহা পাতকীও তোমার শরণ।

লইলে খণ্ডে তার সংসার বন্ধন ॥

জন্মার্ধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।

অন্তে তুমিও সে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই কথা বলিতে বলিতে দস্যুপতি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল। নিত্যানন্দ প্রভু তাহার কাতরোক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নানা প্রকার সাস্তুনা বাক্য বলিলেন।

চোরপতির মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানে না, সে বলিল, “প্রভু ! আমি যখন তোমার প্রতি হিংসা করিয়াছি, তখন আমার এ মহাপাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই । আমি এখন পুণ্য সলিলা ভাগীরথী গর্ভেই আমার এই পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি ।”

তখন—“প্রভু বলে, বিপ্র তুমি ভাগ্যবান বড় ।

জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥

নহিলে এমন কৃপা করিবেন কেনে ।

এ প্রকার অশ্লোকে কি দেখায় ভক্ত বিনে ॥

পতিত পাবন হেতু চৈতন্য গোসাঞি ।

অবতরি আছেন, ইহাতে অশ্লো নাঞি ॥

শুন বিপ্র ! যতেক পাতক কৈলা তুমি ।

আর যদি না কর সে সব নিমু আমি ॥

পরহিংসা ডাকা চুরী সব অনাচার ।

ছাড় গিয়া সব তুমি, না করহ আর ॥

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম ।

তবে তুমি অগোরে করিবা পরিত্রাণ ॥

যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া ।

ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ নিজ গলার মালা খুলিয়া ব্রাহ্মণ কুমারকে দান করিলেন । দস্যুপতি নিত্যানন্দের মালা পরিয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিল । ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সেই হইতে “চোর চুড়ামণি” সাধু শিরোমণি বলিয়া লোকের নিকট পূজিত হইলেন ।



উনত্রিংশ অধ্যায় ।



নিতাই চরিতে সন্দেহ ।

“কৃতানি যানি কস্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তুথা ।

না চরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রদ্ধা চাপি ন কুৎসয়েৎ ॥”

(স্মৃতি বচন ।)

সংসার ক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত থাকাও একদিকে যেমন কষ্টকর, বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করাও অশুভদিকে তেমনি বিপজ্জনক । কারণ উচ্চপদ অহুবীক্ষণ স্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখা যায়, এবং সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে । নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া নূতন লীলার অভিনয় করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ তাঁহার নাম চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ভক্তগণ সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন ; কিন্তু নিন্দুকের পাপচক্ষে ইহা একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল ।

বলাবাহুল্য হর্ষুখ নিন্দুকের এমনই স্বভাব যে অশ্লের ভাল দেখিলেই ইহাদের চোক টাটায়, অশ্লের স্মনাম শ্রবণ করিলেই

ইহাদের গাত্রজালা উপস্থিত হয়, পরগুণে দোষারোপ করিয়াই ইহারা তৃপ্তিলাভ করে। মানুষের মধ্যে ইহারা মক্ষিকা, ছিদ্রাবেষণই ইহাদের কার্য্য।

নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্ম তাঁহাতে কিছুই দেখা যায় না। তাঁহার দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া বসন প্রভৃতি সন্ন্যাসোচিত বেশভূষা কিছুই নাই। তৎপরিবর্তে এখন তাঁহার নাগর বেশ, গলায় মালা, গাত্রে অলঙ্কার, অধরে তাম্বুল রাগ, অথচ তিনি পরম সাধু বলিয়া পরিচিত, অনেকেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সন্মান করে, ইহা ভক্তের নিকট আদরের জিনিস হইলেও নিন্দুকের চক্ষে একেবারে অসহনীয় হইল।

এজ্ঞ কেহ কেহ নিত্যানন্দের নির্ম্মল চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল; অবশেষে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীগোরাঙ্গের সহপাঠি গোরাঙ্গ-ভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ কুমারও নিত্যানন্দ প্রভুর এইরূপ বিলাসিতা দর্শন করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে অত্যন্ত মায়া করেন, স্বয়ং শ্রীগোরাঙ্গ যাঁহাকে সন্মান করেন, তিনি কিরূপেই বা তাঁহার নিন্দা করিবেন? অথচ নিত্যানন্দের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, তাঁহার মানস-সরোবরে সন্দেহের বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এ বাতাস কিছুতেই থামিল না, অবশেষে তিনি এই ব্যাপারের স্বরূপ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত নীলাচলে গমন করিলেন। তথায় তিনি কয়েক দিন বাস করিয়া সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত একদিন নির্জ্জনে মহাপ্রভুকে বলিলেন “প্রভু! আমার একটী নিবেদন আছে। যদি আমাকে নিজভূতা বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে আমার এই সংশয় দূর করিয়া কৃতার্থ করুন। মহাপ্রভু বলিলেন “স্বচ্ছন্দে বল।” তখন ব্রাহ্মণ কুমার

বলিলেন “নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী ; কিন্তু নবদ্বীপে গিয়া তিনি সন্ন্যাস ধর্ম একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

তিনি কপূরবাসিত-তাম্বুল সেবা করেন, মনোহর অলঙ্কার ধারণ করেন, কোঁপীন পরিত্যাগ পূর্বক সুন্দর পটবস্ত্র পরিধান করেন, গলায় সুন্দর মালা ধারণ করেন, শূদ্রের আশ্রমে সর্বদা বাস করেন, অথচ তাঁহাকে সকলেই সন্ন্যাসী বলিয়া সম্মান করে ; এ আবার কিরূপ সন্ন্যাসী ?

আমি ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার এই সংশয় দূর করিয়া কৃতার্থ করুন ।”

“বিপ্রবলে—প্রভু ! মোর এক নিবেদন ।

করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন ॥

মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ।

ইহার কারণ প্রভু ! কহ শ্রীবদনে ॥

নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত ।

কিছুতো না বুঝি মুণ্ডি করেন কিরূপ ॥

সন্ন্যাস আশ্রম তাঁর বলে সর্বজন ।

কপূর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ ॥

ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীয়ে ।

সোনা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে ॥

কষায় কোঁপীন ছাড়ি দিব্য পটবাস ।

ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥

দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে ।
 শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥
 শাস্ত্রমত মুণ্ডি তাঁর না দেখি আচার ।
 এতেক মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার ॥
 বড় লোক বলি তাঁরে বলে সর্বজনে ।
 তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥
 যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ।
 কি মৰ্ম্ম ইহার ? প্রভু ! কহ শ্রীবদনে ॥”

(চৈতন্ত ভাগবত ।)

তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—

“শুন বিপ্র ! যদি মহা অধিকার হয় ।
 তবে তাঁর দোষ গুণ কিছু না জন্মায় ॥”

(চৈতন্ত ভাগবত ।)

বিপ্রবর ! শ্রবণ কর । মহাপুরুষগণের আচার ব্যবহার দর্শন-
 মাত্রেই তাঁহার প্রতি সন্দেহ করা কর্তব্য নহে । কারণ তাঁহারা
 গুণাতীত, পাপ পুণ্য তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না । যাহারা দুর্বল-
 চিত্ত তাহাদের পক্ষেই নিষেধ বা বিধির প্রয়োজন, কিন্তু মহাপুরুষ-
 দিগের পক্ষে তাহা নহে । বিগ্ন স্বর্ণকে যে ভাবেই অগ্নিদগ্ধ করা
 বাক না কেন, কিছুতেই যেমন তাহার ওজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না, সেই প্রকার
 সাধুগণ যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন কিছুতেই তাঁহাদের স্বর্গোরব নষ্ট
 হয় না, এই জ্ঞাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

“ন ময্যেকাস্তত্তত্তানাম্ গুণদোষোদ্ভবাগুণাঃ ।

সাধূনাম্ সমচিন্তানাম্ বুদ্ধেঃ পরমুপেযুষাম্ ॥”

(শ্রীমদ্ভাগবত ।)

অর্থাৎ আমার প্রিয় ভক্তগণ ত্রিগুণাতীত, তাহাদিগকে দোষ বা গুণ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা পাপ পুণ্যে জড়িত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আচার ব্যবহার সর্ব্বথা অকরণীয়। কারণ যে প্রকার নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতীত কেহ হলাহল পান করিলে তাহার মৃত্যু অবশ্যসম্ভাবী, সেই প্রকার মহাপুরুষগণ ব্যতীত অত্র সাধারণ লোকে শাস্ত্র বিগর্হিত আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলেও তাহার পতন অবশ্যসম্ভাবী। পদ্ম পত্রে যেমন জল স্পর্শ হয় না, সেই প্রকার সাধু হৃদয়ও পাপ পুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না। অনিত্য বস্তুতে আসক্তিই দুঃখের কারণ; কিন্তু যিনি সুখে অনাসক্ত, দুঃখে অক্লিষ্ট, তাঁহার পক্ষে সকলই সমান। তিনি পার্থিব সুখদুঃখে জড়িত হন না। পরন্তু দোষ তেজীয়ান্ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। বহি যে প্রকার সর্ব্বভুক্ত, সংসার ক্ষেত্রে ভগবানের লীলা সম্বন্ধে তদ্রূপ। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে যথা;—

“ধর্ম্মব্যতিক্রমোদৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো-যথা ॥”

(শ্রীমদ্ভাগবত ।)

শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়, তাঁহার লীলা চাতুর্য্যের গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করা সাধারণ মানবের সাধ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব উচ্চাধিকারীর স্বভাব ও কর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষরূপ না জানিয়া কখনই তৎসম্বন্ধে নিন্দা বা অগ্রায় সমালোচনা করা উচিত নহে। এইরূপ নিন্দা দ্বারা অনধিকারীর চিন্তে ভেদ বুদ্ধি উপস্থিত হয় ও ক্রমশঃ তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে এবং অবশেষে দুর্ব্বল মানব আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে। এ সম্বন্ধে উপনিষদকারও বলেন;—

“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যত্নে নানেন পশ্যতি ।”

(উপনিষৎ ।)

যে অবিবেকী ভগবানে নানাভাব দেখে, সে মৃত্যুরূপ আবর্তে পড়িয়া থাকে । স্মৃতরাং মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? প্রলোভন পূর্ণ সংসারে থাকিয়া শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করা সহজ ব্যাপার নহে, রাজর্ষি জনকের ত্যায় দুই এক জনই ইহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন, সংসারে থাকিয়া যে ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যাইতে পারে তাহা জগৎকে দেখাইবার জন্যই শ্রীমন্নিত্যানন্দ মুনিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারাত্মক অবলম্বন করিয়াছেন । অতএব—

“শুন বলি ! এই শিক্ষা করাই তোমাতে ।

কভু পাছে নিন্দা হাস্য কর’ বৈষ্ণবেরে ॥

মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে ।

মোরভক্ত নিন্দে, যদি, তারে বিঘ্ন ধরে ॥

মোর ভক্ত প্রতি প্রেম ভক্তি করে যে ।

নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

অপিচ—

“কহিলাম এই বিপ্র ! ভাগবত কথা ।

নিত্যানন্দ প্রতি দিখা ছাড়হ সর্বথা ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী ।

অল্প ভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি ॥

অলৌকিক চেষ্টা যেনা কিছু দেখ তান ।

তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥

পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার ।
 তাঁহা হইতে সর্ব জীবে পাইবে উদ্ধার ॥
 তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার ।
 তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥
 না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ ।
 পাইয়াও বিষ্ণু ভক্তি তার হয় বাধ ॥
 চল বিপ্র ! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও ।
 এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও ॥
 পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে ।
 তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে ॥
 যে তাঁহারে প্রীতি করে সে করে আমারে ।
 সত্য সত্য বিপ্র ! এই কহিল তোমারে ॥
 মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।
 তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

ব্রাহ্মণ কুমার মহাপ্রভুর বচনে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহার সকল সংশয় দূরীভূত হইল, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি উপজাত হইল; তিনি প্রকৃষ্টচিত্তে পুনরায় নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সেবায় রত হইলেন ।



ত্রিংশ অধ্যায় ।

নীলাচলে পুনর্বাণী ।

“যে প্রভু আছিল অতি পরম গভীর,
সে প্রভু হইল প্রেমে পরম অস্থির ॥”

যে নবদ্বীপ শ্রীগোরাঙ্গের বিরহে শোকচ্ছদ পরিধান করিয়-
ছিল, সেই নবদ্বীপ পুনরায় নিত্যানন্দের সঙ্গলাভে আনন্দ সাগরে
ভাসমান হইল । নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ভক্তির ঢেউ তুলিয়া নিত্য নূতন
রসের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন । তাঁহার স্বর্গীয় ভক্তি-
প্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতে শত শত কলুষিত হৃদয় পবিত্র
হইল, নগরে নগরে কীর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হইল, মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনিতে
নবদ্বীপ ধাম মুখরিত হইয়া উঠিল । দয়ালু নিতাই প্রেমের বজায়
শ্রীধাম ভাসাইয়া দিলেন, বিষয়ানুরাগী অন্তর্দৃষ্টি হীন জড়তাবাপন্ন মানব
ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়া ধর্ম্মোন্মুখী হইল, ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে
ধর্ম্মরাজ্যের জড়তার বাধ ভাঙ্গিয়া গেল, মানবগণ নূতন শক্তি লাভ
করিয়া কলিযুগের নবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল । কিন্তু এই

আনন্দ স্থায়ী হইল না, সহসা এই সুখের জোয়ারে পুনরায় তাটা আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দ প্রভু এইরূপ কিছুদিন ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় মহাপ্রভুর দর্শন লাগসায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বহুদিন পরে, প্রবাসী ব্যক্তি জন্মভূমির দর্শন জন্য যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে, বিরহ-বিধুরা নবযুগা যে প্রকার স্থায় পতির সঙ্গ লাভের জন্য অধীরা হইয়া পড়ে, নিতাইচাঁদও শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাগসায় সেইরূপ উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈষ্ণব জগতের শীর্ষস্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গে তদগত প্রাণ নিত্যানন্দ অবিলম্বে শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সপরিবারে নীলাচল যাত্রা করিলেন। দয়াল নিতাই পথি মধ্যে গৌরাঙ্গ গুণ কীর্তন করিতে করিতে বহুতর ব্যক্তিকে পবিত্র করিয়া অবশেষে শ্রীধামের অতি নিকটবর্তী কমলপুর নামক গ্রামে আসিয়া শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাঙ্গ পতিত হইয়া ধরাতল অভিসিক্ত করিতে লাগিল। তাঁহার শরীর প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্পের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং অশ্রু, কন্প, পুলকাদি ভক্তি প্রকাশক ভাব গুলি ক্রমশঃ প্রতি অঙ্গে বিকাশ পাইতে লাগিল। বস্তুতঃ প্রেমিকের বিহ্বলাবস্থার এইরূপ দশাই ঘটে, এই জন্যই চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ মিলনের পূর্বাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন,—

“চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,

পুলক যৌবন ভার।

বাম অঙ্গ আঁথি, সঘনে নাচিছে,

হুলিছে হিয়ার হার ॥”

কিছুকাল অতীত হইলে পর মুচ্ছা ভঙ্গ হইল এবং অমনি “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত” বলিয়া হুঙ্কার করিয়া নিকটবর্তী একটা পুন্ডোদ্যানে যাইয়া ধ্যানভিমিত লোচনে উপবেশন করিলেন । অকস্মাৎ মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ধ্যানমগ্ন নিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ করতঃ স্তুতি করিতে লাগিলেন ।

“গৃহীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেষা শৌণ্ডিকালয়ং ।

তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজং ॥”

নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত ।

শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত ॥

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার ।

সত্য সত্য সত্য ভক্তি যোগ অবতার ॥

স্বর্ণ, মুক্ত, রূপা—কসা রূপাঙ্কাদি রূপে ।

নববিধা ভক্তি ধরিয়াছে নিজ মুখে ॥

নীচ জাতি পতিত অধম যত জন ।

তোমা হইতে সবার হইল বিমোচন ॥

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে ।

তাহা বাঞ্ছে স্মর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥

“স্বতন্ত্র” করিয়া বেদে যে কৃষ্ণের কয় ।

হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥

তোমার মহিমা জানিবার শক্তিকার ।

মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ রস অবতার ॥

বাহু নাহি জান তুমি সংকীৰ্ত্তন মুখে ।

অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।

তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর ॥

অতএব তোমাতে যে জনে প্রীতি করে।

সত্য সত্য কভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে ॥”

(চৈতন্য ভাগবত।)

অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভু জ্ঞান লাভ করিয়া সবিনয়ে মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু, তুমি যে আমাকে স্তুতি করিতেছ ইহা তোমার ভক্ত বাৎসল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কখন কাজ করিতে পারে না। তুমি যাহা করাও আমি তাহাই করিতেছি। তুমিই আমার এক সময় দণ্ড ধারণ করাইয়াছিলে, আবার তুমিই তাহা পরিত্যাগ করাইয়া নানা অলঙ্কারে সাজাইলে, তোমার আদেশেই আমি আমার সেই পরম প্রার্থনীয় মুনিধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা প্রভৃতি ধারণ করিলাম। প্রভু, তোমার এই গুঢ় রহস্যের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার প্রিয় ভক্তমাংসকেই তপভক্তি দান করিলা, কিন্তু শুধু আমিই তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। আমার এই ভোগ বিলাস দর্শন করিয়া সাংসারিক লোক নাড়ের উপহাস করে। তোমার ইচ্ছা কি, তাহা আমি জানি না, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই, তুমি হুত্রধার, আমি নর্ত্তক, আমাকে যে ভাবে নাচাইতেছ, আমি সেই ভাবেই নাচিতেছি।”

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, “শ্রীপাদ! তোমার দেহে যে অলঙ্কার ইহা নববিধ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, সাধারণ মানব ইহাকে অলঙ্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারে; কিন্তু ভক্তগণ জ্ঞানচক্রে ইহাকে শ্রবণ, কীর্ত্তন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নববিধা ভক্তি ব্যতীত

আর কিছুই দর্শন করে না । অহিভূষণ মহাদেব যে প্রকার নাগচ্ছলে অনন্তকে ধারণ করেন, সেইরূপ তুমিও নববিধা ভক্তিচ্ছলে নব অলঙ্কার ধারণ করিয়াছ ; আমি তোমার শ্রীঅঙ্গে ভক্তিরস ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না । তোমার এই অল্পম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি সুখী হইবে, সে নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবে ।

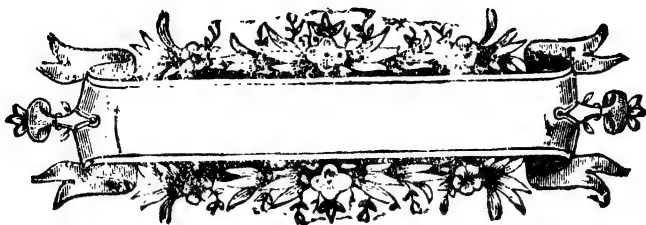
“ইহা দেখি যে স্মৃতি চিত্তে পায় স্থখ ।

সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস দর্শনে অনেকেরই মনে ভেদ বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু মহাপ্রভুর মুখে আজ এই গূঢ় রহস্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া সকলের চিত্ত হইতেই সে সন্দেহ দূরীভূত হইল ; সকলেই ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল ।





একত্রিংশ অধ্যায় ।



:নিত্যানন্দ প্রভুর জগন্নাথ দর্শন ।

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং হেম্ববস্থিতঃ ।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্ ॥”

ইহার পরে প্রভু নীলাচলে উপস্থিত হইলেন । শ্রীজগন্নাথ মূর্তি দর্শনমাত্রে তাঁহার শরীর ভগবৎ-প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, অমনি তিনি অমুরাগতরে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি বাইতে লাগিলেন । জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তি দর্শন করিয়া অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দের অদ্ভুত প্রেম ও তীব্র ভক্তি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণ শ্রীবিগ্রহের গলার মালা আনিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে পরাইয়া দিলেন । প্রভু সকলকেই প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, তাঁহার প্রেমাশ্রুতে জগন্নাথ সেবকগণের শরীর সিক্ত হইল এবং ভক্তগণ সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিল ।

এইরূপে শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া প্রভু গদাধর-গৃহে গমন করিলেন । গদাধর নিত্যানন্দে পরম তত্ত্ব, বহুদিনের পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়া

আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। পরম সমাদরে নিতাইটাদকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তিনি গোড়দেশ হইতে এক মণ সূক্ষ্ম আতপ তণ্ডুল এবং একখানা সুন্দর রঙ্গিন বস্ত্র গদাধরের জন্ত আনিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া প্রভু উহা গদাধরের করকমলে অর্পণ করিয়া বলিলেন, “গদাধর ! আজ এই তণ্ডুল রন্ধন করিয়া শ্রীগোপীনাথের ভোগ দিবে।” এই কথা শুনিয়া গদাধর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, “কি সুন্দর চাউল ! এরূপ তণ্ডুল তো কখন দেখি নাই ? ইহা কি প্রভু বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীগোপীনাথের ভোগের জন্ত আনিয়াছেন ?”

নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে ।

একমণ চাউল আনিয়াছেন যতনে ॥

অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্বমতে ।

গদাধর লাগি আনিয়াছেন গোড় হৈতে ॥

আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিন সুন্দর ।

ছই আনি দিলা গদাধরের গোচর ॥

গদাধর ! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন ।

শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥

(চৈতন্য ভাগবত ।)

গদাধর হৃষ্টচিত্তে সুন্দর রঙ্গিন বস্ত্র গোপীনাথকে পরাইলেন, এবং তাড়াতাড়ি টোটার গিয়া শাক তুলিয়া আনিলেন। সেই তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত হইলে শাক পাক করিলেন, এবং কোমল তেঁতুল পত্র দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করিলেন।

গদাধর পরমানন্দে গোপীনাথের ভোগ সরাইলেন । এমন সময় শ্রীগোরাঙ্গ স্বয়ং “হরেকৃষ্ণ” ধ্বনি করিতে করিতে গদাধরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া “গদাধর ! গদাধর !” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । গদাধর তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া সসন্ত্রমে মহাপ্রভুর চরণ যুগল বন্দনা করিলেন । মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, “গদাধর ! আজ আমার নিমন্ত্রণ নাই কেন ? আমি তো তোমাদেরই একজন । বিশেষতঃ নিত্যানন্দ-দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ এবং তোমার রন্ধন, ইহাতে অবশ্যই আমার ভাগ আছে । মহাপ্রভুর এই প্রকার সদয় ব্যবহার দর্শনে গদাধর সুখ-সাগরে মগ্ন হইলেন । পরমানন্দে দুই প্রভুকে একত্র বসাইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন । প্রভু তখন নিত্যানন্দ দত্ত ততুল ও গদাধরের পাকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন ;—

“—এ অন্নের গন্ধেও সর্বথা ।

কৃষ্ণ ভক্তি হয় ইথে নাহিক অগ্ৰথা ॥

গদাধর ! কি তোমার মনোহর পাক ।

আমিতো এমন কভু খাই নাই শাক ॥

গদাধর ! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন ।

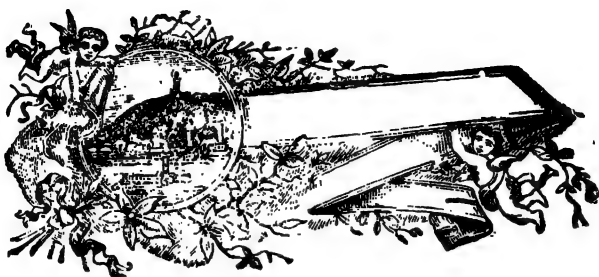
তৈঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥

বুঝিলাম বৈকুণ্ঠের রন্ধন কর তুমি ।

ভবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি ॥”

(চৈতন্য ভাগবত ।)

তারপর তিন প্রভু পরমানন্দে ভোজন শেষ করিয়া উঠিলেন । ভক্তগণ ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ।



দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

—:—

বিদায় বার্তা ।

“পথে পথে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যায় চলি ।

মধু পানে মত্ত যেন পড়ে চলি চলি ॥”

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জনে ডাকিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ ! তুমি গোড়দেশে যাইয়া সংসারধর্ম অবলম্বন কর, নতুবা কলির জীবের নিস্তার নাই । তোমার গৃহেই পুনরায় আমি অবতার গ্রহণ করিব, তুমি অবিলম্বে গোড়দেশে গমন করিয়া পাপক্লিষ্ট জীবগণকে মধুর হরিনাম দ্বারা উদ্ধার কর ।” +

“তুমি যাও গোড়দেশে করহ সংসার ।

তবে সে এসব লোকের হইবে নিস্তার ॥

পুনঃ আসিব আমি তোমার মন্দিরে ।

তোমার গৃহে হবে আমার অবতारे ॥”

নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ।

নিত্যানন্দ কহিলেন—“—সকলি কর তুমি ।

তুমি যন্ত্রী হও, যন্ত্র তুল্য হই আমি ॥

যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা ।

কে আছে, স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা ॥

বিশেষে আমার তুমি হর্তা, কর্তা, ভর্তা ।

বিকৰ্ম্ম, স্ককৰ্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা ॥

অবধৃত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা ।

মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়া রহিলা ॥

কিছু দিন বই মোরে দরশন দিয়া ।

নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া ॥

আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা ।

ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা ॥

পুনঃ ভূষা পরাইলে করিলে বিষই ।

আপনা বুঝিতে নারি কখন কি হই ॥

তুমি মোরে কহিতেছ করিতে সংসার ।

আপনেত জাতি ধৰ্ম্ম করিলে স্বীকার ॥

রমণী লম্পট ছাড়ি কীর্তন লম্পটে ।

সব ভোগ ত্যাগ করি ভিখারির কটে ॥

এমন নিগ্রহ কেন করিছ গোসাঞি ।

তুমি সে অনন্য গতি মোর নাঞি ॥”

এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ মৌনভাবে অবলম্বন করিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ ! তুমি মূর্তিমান আনন্দ-স্বরূপ, তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার স্নেহের একমাত্র কারণ, সকল সময়েই তোমাতে আমাতে অভিন্ন কলেবর, মন্থরের ডাল যে প্রকার দৃশ্যতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিয়াও মূলে অভিন্ন ভাবেই অবস্থান করে, তুমি আমিও সেই প্রকার কলিকালের অবতার সাধন জন্ত দৃশ্যতঃ পৃথক্ভাবে অবস্থান করিয়াও কার্য্যতঃ অবিচ্ছিন্ন ভাবেই থাকিব। এ জন্ত তুমি বৃথা দুঃখ করিও না।”

নিত্যানন্দ কহিলেন, “প্রভু, তুমি বৃথা কপটবাক্যে আমার মনস্তপ্তি সম্পাদন করিতেছ, তোমার ঋত কপটাচারী আর দ্বিতীয় নাই। পুরাকালে তুমি গোপীগণকে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইয়া উদাস করিলে, কিন্তু তাহারা সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করতঃ তোমাকে ভজনা করিয়াও তোমার সঙ্গলাভ করিতে পারিল না। ভক্তগণকে বিরহ বন্ধনে দগ্ধ করাই তোমার স্বভাব, তুমি আমাকে আর বৃথা ছলনা করিও না, সত্য করিয়া বল কখন তোমার সাক্ষাৎ পাইব ? আমি তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবনা।”

তখন—“প্রভু কহে—প্রতি বর্ষে এখানা আসিবা।

ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা ॥

তোমার নর্দনে আর মাতার রন্ধনে।

নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই স্থানে ॥

রাত্রি দিনে রাখা ভাবে ভাবিত হইয়া।

কৃষ্ণের বিরহ সব আশ্বাদ করিয়া ॥

অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব।

তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব ॥

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । মহাপ্রভু আসিয়া নিতাইচাঁদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন । তার পর দুই প্রভু গলাগলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । তাঁহাদের প্রেমাশ্রুতে ভূমিতল সিক্ত হইল । এইরূপে সমুদয় রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে উভয়ে শ্রীজগন্নাথের মূর্তি দর্শন করিলেন । সেইদিন হইতে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সাধুসঙ্গের পরিবর্তে নির্জন বাসই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বহি প্রবলবেগে হৃদয় ক্ষেত্রে জলিয়া উঠিল ।

সেই দিন হইতে প্রভুর হৈল কোন্ দশা ।

নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা ॥

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এই সকল গূঢ় রহস্য সকলে জানিতে পারিল না, শুধু দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ইহা জানিতে পারিলেন । অতঃপর ভক্তগণ একে একে মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । অবশেষে নিত্যানন্দ প্রভুও পারিষদগণ সহ মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নীলাচল হইতে গোড়দেশাভিমুখে রওনা হইলেন ।

“পথে পথে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যায় চলি ।

মধুপানে মত্ত যেন পড়ে চলি চলি ॥”

(চৈতন্ত ভাগবত ।)

এইরূপে গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে যাইতে পানিহাটীগ্রামে রাঘব-গৃহে উপস্থিত হইলেন । প্রভুর আগমন বার্তা শ্রবণে ধর্ম্মানুরাগী ভক্তগণ মহোৎসব দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রভু ভক্তগণ লইয়া

পরমানন্দে সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন । গোড়দেশে ভক্তি-মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে বিধৌত হইয়া গেল, সংকীৰ্ত্তনের বিজয় ছন্দুতি দিগ্ভাঙল নিনাদিত করিয়া বাজিয়া উঠিল, ত্রিতাপদগ্ন মানবের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল ।

দয়াল নিতাই অমনি হরিনামের ভেরী বাজাইয়া গগনভেদী সুরে ঘোষণা করিলেন, “জীবগণ ! ভয় নাই ! আমি হরিনামের বতায় দেশ ভাগাইয়া দিব । তোমরা জাতিধৰ্ম্মনির্বিশেষে যে সুধামাখা মধুর হরিনাম একবার গ্রহণ করিবে, সেই সংসারের সকল যন্ত্রণা এড়াইয়া মুক্তিলাভ করিবে ।”

জগৎ দেখিল, ত্রিলোক জানিল, বিশ্ববাসী প্রাণীমাত্রেই বুঝিল যে ত্রিভুবনে এমন দয়াল আর নাই ; মরজগতে এ ছবি অতুল্য !





ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় ।

নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ ।

“বারুণী রেবতী দৌহে বসুধা জাহ্নবা ।

নিত্যানন্দ প্রিয়া দৌহে অতুলন প্রভা ॥”

মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় হওয়ার পর হইতেই দয়ালু নিতাইর যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল । যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম এতকাল যাবৎ পালন করিয়া আসিয়াছেন, মহাপ্রভুর আদেশে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল, ইহা যে তাঁহার পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ সংসারাশ্রমী ব্যক্তিকে ধর্ম্মোন্মুখী করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, এখন ইহাই তাঁহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িল । অবশেষে স্থির করিলেন, যে সংসারাসক্ত মানবকে গৃহে রাখিয়া ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিতে হইলে আমাকেও রীতিমত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে । নতুবা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না ; কিন্তু সংসারী হইতে হইলেই বিবাহের প্রয়োজন, অতথা গৃহধর্ম্ম পালন অসম্ভব । কারণ শাস্ত্রে আছে “ন গৃহং

গৃহমিত্যাহ গৃহিণী গৃহযুচ্যতে ।” এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে বিবাহ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন । তৎপর একদিন নিত্যানন্দ প্রভু প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার প্রিয় পার্শ্বদ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া অশ্বিকা নগরে গমন করিলেন । এই স্থানে ভগবন্নিষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস । গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাস্বরের পরম প্রিয় ভক্ত ছিলেন । ইনি নিম্ন কাণ্ঠে চৈতন্য বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া অশ্বিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । শুনা যায় চৈতন্যদেবের স্বহস্ত লিখিত গীতা গ্রন্থখানি ইঁহার নিকট রক্ষিত ছিল ।

ইঁহার ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিত রাজকার্য্য করিতেন এবং রাজানুগ্রহে “সরথেন” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার বসুধা ও জাহ্নবা নামী দুইটা পরম রূপবতী কন্যা ছিল । নিত্যানন্দ প্রভু সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারে উপস্থিত হইয়াই সহস্র দত্ত মহাশয়কে নিজের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করাইবার জন্ত অন্তঃপুরে পাঠাইলেন । দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রভুর আগমন বার্তা শ্রবণ মাত্রে সূর্য্যদাস পণ্ডিত বহির্দ্বারটিতে আসিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলেন এবং “আজ আমার পরম সৌভাগ্য” বলিয়া সবিনয় সম্ভাষণ জানাইলেন ।

তখন “প্রভু কহে তোমা কাছে আইলাম আমি ।

বিবাহ করিব মোরে কহা দেহ তুমি ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এদিকে সূর্য্যদাসের কন্যাদ্বয় বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছেন, কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইলে পিতার কিরূপ হুশ্চিন্তা হয়, তাহা অবর্ণনীয় ; সূর্য্যদাসও মনে করিতেছেন যে, কন্যাদ্বয়কে এখন সংপাত্ৰস্থা করিতে পারিলেই এক দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, এইরূপাবস্থায়

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে কন্যাপ্রার্থী হইতে দেখিয়া ইহা ভগবানেরই অনুগ্রহ মনে করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন । কিন্তু কি করিবেন নিত্যানন্দ গৃহাশ্রমী নন, তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাকে কন্যা দান করা সামাজিক নীতির বিরুদ্ধ ; কাজেই প্রভুর প্রস্তাবে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না । স্বর্য্যদাস বলিলেন—

“প্রভু ইহা কৈছে হয় ।

বর্ণযুক্ত গ্রহা চারি আছে জাতিভয় ॥

যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ ।

তথাপিও বর্ণভাগী আমি যে ব্রাহ্মণ ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ চলিয়া গেলেন । স্বর্য্যদাস মনে করিলেন, কোথায় প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া উপযুক্ত পাত্র যোঁটান যায় না, আর আমার প্রতি স্নেহসন্ন হইয়া স্বয়ং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অযাচিতভাবে আমার কন্যাপ্রার্থী হইয়া আসিয়া আলায়ে উপস্থিত ! “হে ক্লেশ ! এমন ভাগ্য কি আমার হবে যে, নিত্যানন্দ আমার জামাতা হইবেন ?” এই কথা বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং গত রাত্রির স্বপ্ন সফল হইল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । ক্ষণকাল পরে বন্ধু বান্ধবকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনাইলেন, এবং বলিলেন যে, “আমি গত রাত্রিতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি । দেখিলাম তালধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার শুভ্র-গৌরবাস্তি প্রকাণ্ড শরীর, অরুণায়ত আঁধি, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে হল মুম্বল, পরিধানে নীলবস্ত্র, চরণে নুপুর । আমাকে

বলিলেন, “আমি তোমার কণ্ঠা বিবাহ করিব ।” এই কথা বলিয়াই অমনি অন্তর্হিত হইলেন ।” সূর্য্যদাস পণ্ডিত এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত তাঁহার বন্ধু বান্ধবকে বলিবার সময় গৃহমধ্যে থাকিয়া বসুধা দেবী উহা শুনিতে পাইলেন । স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র বসুধা দেবী প্রীতি-প্রফুল্লিতা হইলেন । তাঁহার স্বাভাবিক প্রেম-সিদ্ধি উথলিয়া উঠিল । প্রেম-সমুদ্রের প্রবল প্রবাহে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল । তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি হৃদয়ের তীব্র জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনার মুখচন্দ্র আবৃত করিলেন । অল্পবয়স্কা তরলমতি নববালার পক্ষে একরূপ আত্মবিস্মৃতি এবং উদ্ভ্রান্ত ভাব বড়ই অস্বাভাবিক ; কিন্তু পাঠক ! :ইহা মর-জগতে অস্বাভাবিক হইলেও ভক্তির রাজ্যে ভগবানের লীলা বৈচিত্র্য ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

নিত্যানন্দ-বিরহ-বিধুরা বসুধাদেবী ক্রমশঃ তাঁহার ভাবী পতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনুরাগ বিহ্বলা হইয়া অবশেষে মুচ্ছাগত হইলেন । অকস্মাৎ বসুধার কি হৈল কি হৈল বলিয়া গৃহমধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, সকলে দৌড়িয়া বাইয়া দেখিলেন, কণ্ঠা মুচ্ছাগত, জ্ঞান মাত্র নাই, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, বদনমণ্ডল হইতে অবিরত স্বেদশ্রুতি নির্গত হইতেছে । কন্যার এইরূপ মুমূর্ষাবস্থা দর্শন করিয়া সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাঁহাকে মণ্ডপ দ্বারা শোয়াইলেন । তাড়াতাড়ি চিকিৎসক ডাকা হইল । তাহারা অকস্মাৎ বিকার প্রাপ্ত অপস্মার-ব্যাদি বলিয়া নির্দেশ করিলেন । নানা প্রকার ঔষধ সেবন করান হইল, কিন্তু ফলোদয় হইল না ; অবশেষে চিকিৎসকগণ বলিলেন “আর চিকিৎসার সময় নাই, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ; শীঘ্র গঙ্গাতীরে লইয়া যাইয়া ইহার পরমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করুন ।”

“এবে কর ইহার পরমার্থের চেম্চা ।

গঙ্গাতীরে লও তব কণ্ঠাকুল জ্যোষ্ঠা ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এই কথা শুনিয়া সূর্য্যদাস বিষাদভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ভ্রাতার ক্রন্দন শ্রুতি শুনিয়া গৌরীদাস আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তুমি বাস্তব হইও না, আমার বোধ হয় অবধূতের অবমাননাই এই আকস্মিক বিপদের কারণ । তুমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া এখানে লইয়া আইস । যদি তিনি ইহাকে বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার করেই এই কন্যারত্ন সমর্পণ করিব ।

প্রতিবাসিগণও সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, “চল সকলে যাইয়া অবধূতের পায়ে পড়ি ।” গৌরীদাস প্রমুখ ভক্তগণ এই কথা বলিয়া অবধূতের নিকট গমন করিলেন । এদিকে নিতাইচাঁদ গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে প্রেমাবিষ্ট হইয়া অবিবর্ত ক্লেশ, ক্লেশ, ধ্বনি করিতেছেন এবং নয়ন যুগল হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে । এমন সময়ে সকলে যাইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিল । প্রভু গৌরীদাসকে উঠাইয়া বলিলেন, “ভুলিয়া রহিলে সব মুখ গোয়ালিয়া ।” গৌরীদাস দয়াল নিতাইর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

বৃষ্টি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে ।

ফিরিয়ে আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে ॥

যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ বাবহার ।

মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার ॥

বাঁচাইতে পারে যদি কণ্ঠা দিব তাঁরে ।

এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিলু সবারে ॥

নিঃ বংশবিস্তার ।

“আপনি লুটিলা সব মোরে ভুলাইয়া ॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম্য বর্গ না ছাড়ালে মোর ।

সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর ॥

শীঘ্র শ্রীচরণ তব করাহ বিজয় ৷

দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয় ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এই কথা বলিয়া প্রভুকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন । যে স্থানে বসুধা দেবী গুইয়াছিলেন, দয়াল নিতাই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

প্রভুর আগমনে অকস্মাৎ সুগন্ধে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল । তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বাতাস পাইয়া বসুধাদেবীর নিজীব দেহে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, শরীরে নব শক্তির বিকাশ পাইল, তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন । নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শনমাত্রে জ্বলন্ত-যৌবনা ব্রীড়াবনতা-বসুধা, “এ কি ! এ কি !” বলিয়া বস্ত্রাঙ্কলে বদন মণ্ডল আরত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন । এদিকে নিত্যানন্দও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া লীলা প্রকাশে যত্নবশত ধারণ করিলেন । দর্শকগণ দেখিলেন,—

“প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্তি যড়ভুজ হৈল ॥

উর্দ্ধে ধনুর্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুখল ।

নয় দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমণ্ডল ॥

মস্তকে কীরিট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল ।

সর্ব অঙ্গে মণি ভূষা করে ঝল মল ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

প্রভুর এই প্রকার ঐশী শক্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন । স্বর্ঘ্যদাস ও গৌরীদাস উভয়ে কৃতাজ্ঞলিপুটে স্তুতি করিতে লাগিলেন । এদিকে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত বসুধাদেবীর বিবাহ হইবে এ সিদ্ধান্ত পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে । এক্ষণে উপস্থিত কুলীন ও কুলাচার্য্যগণ সকলেই মনে করিলেন যে, নিত্যানন্দ সহজ মনুষ্য নহেন, ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, ইঁহার সহিত বসুধার নিশ্চয়ই বিবাহ দিতে হইবে । কিন্তু নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, এক্রপাবস্থায় বিবাহ দেওয়া সামাজিক ভাবে শাস্ত্রসঙ্গত নহে । কাজেই তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, নিত্যানন্দকে পুনরায় বৈদিক সংস্কারে উপনয়ন দিতে হইবে এবং পূর্ণাশ্রমের গাঁই, গোত্র সমুদয় ঠিক করিয়া তদনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে । দয়াল নিতাই এই প্রস্তাব শুনিয়া অটুহাস্য করিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন,—

“যাকর তাহাই কর মোর দায় নাই ।

একলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

প্রভুর অনুকূল উত্তর শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । স্বর্ঘ্যদাস পণ্ডিত উপনয়নের অঙ্গীয় সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিলেন । যথারীতি নিতাইচাঁদের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল । অতঃপর বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল ! আচার্য্য আসিয়া বিবাহের শুভদিন নির্ধারণ করিলেন, স্বর্ঘ্যদাস পণ্ডিত সমুদয় আত্মীয়গণকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন । শালিগ্রামে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল, শত শত নর-নারী প্রতিদিন ভোজন করিতে লাগিল, ভোজন ব্যাপারে দীর্ঘতাঃ

ভোজ্যভাং শব্দে দিব্বাণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। যথারীতি
অধিবাসাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে বিবাহের শুভলগ্ন উপস্থিত হইল।
সূর্য্যদাস নিজে বরকে ষিমোহনাবেশে সাজাইয়া দিলেন। শিল্পকুশলা
যুবতী রমণীগণ স্বভাব-সুন্দরী বসুধাকে নানা প্রকার বিবিধ বসন ভূষণে
সজ্জিতা করিলেন।

“সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ মোহন ।

তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন ॥

সহজেই প্রেমমত্ত ঘূর্ণিত লোচন ।

তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন ॥

উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে ।

সে মুখের শোভা বিধুমণ্ডল বালকে ॥

পরিসর হৃদয়ে মগ্নিত ঘন সার ।

মিলিতে চন্দন যেন সান্ধাৎ শৃঙ্গার ॥

শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুভ্র উপবীত ।

বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত ॥

মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল ।

সর্ব্বদাঙ্গ সুবর্ণ ভূষা করে বালমল ॥

শিল্পি পণ্ডিতা সে নারী বসিয়া নির্জ্জনে ।

বসুধার অঙ্গবেশ করে এক মনে ॥

করে চিরুণী ধরি কেশ সংস্কার করি ।

বন্ধন করিল কত ছান্দেতে কবরী ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

যথাকালে নিতাইটাদের শুভ বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল । হরপার্বতীর মিলন যেরূপ মনোহর, রাধাকৃষ্ণের সন্মিলন যেমন নয়ন রঞ্জন, নিত্যানন্দ প্রভু এবং বসুধাদেবীর যুগল চিত্রও সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইল । বিবাহের পর নিত্যানন্দ কিছুদিন শ্বশুরালায়ে অবস্থান করিলেন । একদিন প্রভু আহারে বসিরাছেন, জাহ্নবাদেবী অন্ন বাজনাদি পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ জাহ্নবার মাথার কাপড় পড়িয়া গেল, অমনি লজ্জিতা জাহ্নবা চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া অপর দুই হাতে মাথার কাপড় টানিয়া লইলেন । * ইহা দেখিয়া নিতাইটাদ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দক্ষিণভাগে আনিয়া বসাইলেন এবং শ্বশুর স্বর্গ্যদাসকে ডাকিয়া বলিলেন “তোমার কনিষ্ঠা কণ্ঠাকে যৌতুকস্বরূপ গ্রহণ করিলাম ।” স্বর্গ্যদাস নিত্যানন্দের অবাচিত অন্নগ্রহ দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং “প্রভু তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, জাতি, প্রাণ, ধন, মান, পরিজন সমুদয়ই তোমাকে অর্পণ করিলাম ।” এই কথা বলিয়া পরমানন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । এইরূপে নিতাইটাদ স্বর্গ্যদাস পণ্ডিতের দুই কণ্ঠাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন । মহাপ্রভুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়া । অবৈত প্রভুর দুই পত্নী, শ্রী ও সীতা । নিত্যানন্দ প্রভুর

“স্বর্গ্য দাসের কণ্ঠা হন বহুর কনিষ্ঠা ।

বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তার নিষ্ঠা ॥

পারসিতে মন্তকের বসন ঝলিলা ।

আর দুই ভুজে বাস সংভ্রম করিলা ॥

ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষণা ।

বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া ॥

নিঃ সংস্কার ।

দুই পত্নী হইলেন, বসুধা ও জাহ্নবা । অনেকে মনে করিতে পারেন যে নিত্যানন্দ প্রভু লীলাচ্ছলে গৃহধর্ম অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দুই বিবাহের আবশ্যকতা কি ? ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য আছে, ইহার উত্তরে এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে দ্বাপরের সহিত কলির সম্বন্ধ রক্ষাই ইহার একমাত্র কারণ । যে হেতু দ্বাপরে বলরামের বারুণী ও রেবতী নামে দুইটী স্ত্রী ছিলেন, কলিতে গৌরঙ্গ-লীলায়ও সেই ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্তই বারুণী বসুধা রূপে এবং রেবতী জাহ্নবা রূপে জন্মগ্রহণ করেন ।

“বারুণী রেবতী দৌহে বসুধা জাহ্নবা ।

নিত্যানন্দ-প্রিয়া দৌহে অতুলন প্রভা ॥

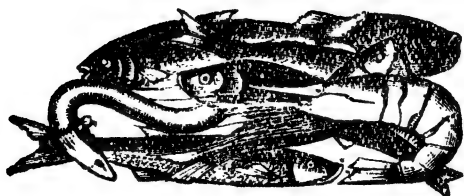
স্ব্যাসম তেজশীল স্বর্ঘ্যদাস বেঁহো ।

পূর্বের বে ককুমা নাম মহারাজা তেহো ॥

রেবতীর পিতা এবো প্রভুর পার্শদ ।

করিতে আছিল লীলা অপূর্ব বিনোদ ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।



এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নের গৃহে নানাপ্রকার অলৌকিক লীলা রহস্য প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রভুর মনে ঐশ্বর্য্যভাব প্রদর্শনের ইচ্ছা উপজাত হইল। একদিন নিতাইচাঁদ পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছেন, বসুম্বাদেবী তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন, এবং জাহ্নবাদেবী তাঁহার সুন্দর অধরে কপূরবাসিত তাম্বুল

দিতেছেন, চতুর্দিকে সখিগণ চামর ব্যঞ্জন করিতেছে, এমন সময় প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে বিদ্যুৎবেগে অপূর্ণ জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল, সেই অপূর্ণ জ্যোতিতে সমুদয় গৃহ উদ্ভাসিত হইল, ক্রমশঃ সেই জ্যোতি বাহিরে আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে প্রভু ষড়ভুজমূর্তি ধারণ করিলেন, অনন্তদেব সহস্র ফণায় ছত্র ধারণ করিলেন । সূর্য্যাদাস ও গৌরীদাস দুই ভাই অত্র গৃহে ছিলেন, তাঁহারা অকস্মাৎ দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন । অবশেষে নিত্যানন্দের শয়ন গৃহে উপস্থিত হইলেন যাইয়া দেখেন যে, “প্রভু পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া দুই হস্তে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন । তাঁহার ষড়ভুজমূর্তি, বক্ষে আজানুলম্বিত বনমালা, হস্তে শ্রীহল ও মুঘল, অপর দুই হস্তে ধনুর্কান শোভা পাইতেছে ।

বসুধা ও জাহ্নবাদেবী প্রত্যেকেই চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ করিয়া প্রভু পার্শ্বে উপবিষ্টা, তাঁহাদের শুভ্র গৌরবাস্তিতে গৃহ আলোকিত, পরিধানে নীলবাস, কাটিতে কিকিণী, নানা অলঙ্কারে সর্ব্বদা সুষোভিত । এই

“কোটি কোটি চন্দ্র জিনি তেজ নাহি অন্ত ।

সহস্র ফণায় ছত্র ধরিয়া অনন্ত ॥

অঙ্গ ভবাদিক আদি গোর করি কর ।

সনক নারদ বাস আর শুকবর ॥

প্রভু, প্রভু করিয়া সবেই করে স্তুতি ।

ঝলমল অঙ্গছটা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃ ॥

মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর ।

সূর্য্যাদাস গৌরীদাস ছিল বাড়ার ভিতর ॥

মহাতেজঃ দেখে সবে চমৎকার হৈলা ।

জামাতা অলয়ে দুই ধাইয়া যে গেলা ॥

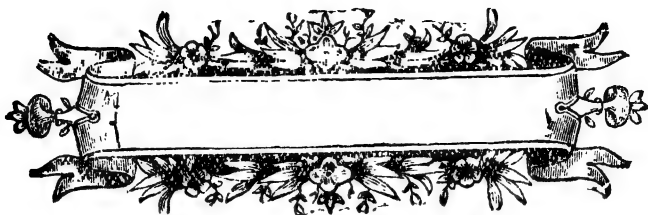
দেখিলা পালঙ্কোপরি প্রভু শুইয়াছে ।

দুই কস্তা চতুর্ভুজা দেখি প্রভুর কাছে ॥”

নিঃ বংশবিশ্ভার।

অভূতপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া পার্শ্বদৃগণ “জয় বলদেব বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু দেখিলেন, তাঁহার তেজঃ বাহিরের লোকে সহ করিতে পারিতেছে না, অমনি তিনি ঐশ্বর্য্যভাব সংবরণ করিয়া মুচ্ছিত ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া উঠাইলেন। প্রভুর অঙ্গ স্পর্শমাত্র তাঁহারা চৈতন্যলাভ করিলেন। তার পর দুই ভাই প্রভুর চরণ ধরিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী প্রভুর অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া সকলেই ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল।





পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।



শ্রীপাট খড়দহে গমন ।

“গৃহাশ্রমী ধর্ম প্রভু সকলি করিল ।

“শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ” সেবা প্রকাশিল ॥”

বিষয়-বিরাগী নিতাইচাঁদ আত্মা ভগবানে ও দেহ সংসারে অর্পণ পূর্বক নবীনা গৃহিণী লইয়া পুনরায় গৃহাশ্রমী হইলেন। সংসার ধর্ম পালন করিতে হইলেই বাসস্থানের প্রয়োজন ; ইহাই মনে করিয়া তিনি খড়দহ গ্রামে “শ্রীপাট” করার ইচ্ছা করিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীপাট খড়দহ অধিক দূরবর্তী নহে। পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরেই এই নগর অবস্থিত। বর্তমান সময়ে ইহা একটা উন্নতিশীল নগররূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তখন খড়দহ একরূপ মনোহর অট্টালিকা পরিপূর্ণ অসংখ্য অধিবাসী পরিবেষ্টিত সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ছিল না। তখন ইহা প্রকৃতির নিস্তরক ক্রোড়ে বাস করিতেছিল। মহাপুরুষগণ প্রায়ই নির্জনপ্রিয় ; তাঁহারা সংসারের কোলাহলময় অশান্তিপূর্ণ স্থানে থাকিতে ভালবাসেন না,

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ নির্জন স্থানে থাকিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ।
নিত্যানন্দ খড়দহের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই তথায়
বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন । তথায় তাঁহার মন্দির প্রস্তুত হইল ।
বসুধা ও জাহ্নবাদেবীকে লইয়া প্রভু খড়দহে গমন করিলেন । স্বয়ং
ভগবানের পদার্পণে খড়দহ পুণ্যভূমিতে পরিণত হইল । নিতাইচাঁদ
তথায় “শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ” প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।

“গৃহাশ্রমী ধর্ম্ম প্রভু সকলি করিল ।

“শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ” সেবা প্রকাশিল ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

তখন তিনি সম্পূর্ণ গৃহী হইয়া গৃহাশ্রমের ধর্ম্ম সকল পালন করিতে
লাগিলেন । ভক্তবৃন্দ সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন, খড়দহে আনন্দ-ধারা
প্রবাহিত হইল, খড়দহ মহাতীর্থে পরিণত হইল । বসুধা ও জাহ্নবা
পরমানন্দে প্রভুর চরণসেবা করিতে লাগিলেন, প্রভুও তাঁহাদের
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন ।

“শ্রীবসু জাহ্নবা দৌহে চরণ সেবয়ে ।

কারে কোন্ শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে ॥

তুই প্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া ।

তুই প্রিয়ার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ॥

তুই প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর ।

নিত্যানন্দ হেন স্বামী পেয়ে প্রেমভোর ॥

চৈতন্য চরণে দৌহে প্রার্থনা করয় ।

জন্মে জন্মে যেন স্বামী মিত্যানন্দ হয় ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বসুধাদেবী গর্ভবতী হইলেন ।
 দেখিতে দেখিতে দশমাস উত্তীর্ণ হইল ; কিন্তু প্রসব হইল না । এই
 রূপে ক্রমে ক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মাস অতীত হইল
 কিন্তু সন্তান প্রসব হইল না দেখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই চিন্তিত
 হইলেন । শ্রীগৌরাস্বরের আবির্ভাবের সময় শিচীমাতার যেরূপ অবস্থা
 হইয়াছিল, বসুধাদেবীরও ঠিক সেইরূপ দশা ঘটিল । অবশেষে পঞ্চদশ
 মাস উপস্থিত হইলে অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দশীতে বসুধাদেবী একটা
 পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন । ইহার নাম বীরচন্দ্র । নবপ্রসূত বালকের
 অনুপম সৌন্দর্য্য ও তেজঃপুঞ্জকান্তি দর্শন করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট
 হইলেন । কুলবধূগণ আসিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে বসুধাদেবীর প্রশংসা
 করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

“যত কুলবধু আসি, বালক দেখিয়া হাসি,

প্রশংসয়ে ধন্য ধন্য করি ।

বসুনক্ষী ভাগ্যবতী, পুত্র প্রসবিল সতা,

ভুবন মোহন বলিহারি ॥

বালকের দরশনে, সবে চমৎকার মনে,

কোন মহাপুরুষ নিশ্চয় ।

বৃন্দাবন দাস কহে, প্রাকৃত বালক নহে,

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হয় ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

বীরচন্দ্র শশীকলার গ্রায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । নানা
 স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া এই নব-প্রসূত বালকের মুখচন্দ্র দর্শন
 করিতে লাগিলেন ।

একদিন নিত্যানন্দ প্রভু বাহিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীগোরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত অভিরাম আসিয়া তাঁহাকে “দাদা বলাই !” সম্বোধনে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ প্রভু অমনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । তখন অভিরাম বলিলেন, “প্রভু, গুণিলাম তোমার নাকি বেছলে হইয়েছে ? আমাকে সেই পুত্র দেখাও, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব ।”

নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন “এ সম্বন্ধে তুমিহঁতো সকল জান, কোথা হইতে কে আসিয়া আবিভূত হইল আমি তাহার কিছুই জানি না ।

“নিত্যানন্দ কহে “তুমি সকলি জান সে ।

আমিতো না জানি কোথাকারে আইল কে ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এইরূপে দুইজনে ঠারে ঠারে নানা কথা কহিতে লাগিলেন । এদিকে অভিরামের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া বসুধাদেবী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন । কারণ অভিরাম অতি দৈবশক্তি সম্পন্ন পুরুষ । তাঁহার প্রণাম বাহিরের লোকে সহ্য করিতে পারে না । শুনা যায় তিনি কোন দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিদীর্ণ হইয়া যায় । এই জন্য বসুধা দেবী অভিরামকে পুত্র দেখাইতে

একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে ।

হেনকালে অভিরাম আইলা সম্মুখে ॥

দাদারে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল ।

প্রাঙ্গণে আসিয়া পুনঃ অনেক হাসিল ॥”

নিঃ বংশবিস্তার ।

ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভিরাম নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর কি তাঁহাকে পুত্র না দেখাইয়া পারেন? স্নেহবতী মাতা অমনি ত্রাসিত চিত্তে অভিরামকে পুত্র দেখাইতে লাগিলেন। অভিরাম দেখিলেন—

“বীরচন্দ্র শুইয়াছে খট্টার উপরি ।

দিব্য সুরঙ্গ বস্ত্রখণ্ড বক্ষেতে ধরি ॥

আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা ।

প্রদোষে কমল কোষে ডুবিছে ভ্রমরা ॥

কজ্জল উজ্জ্বল রেখা শ্রবণের কাছে ।

গোময় অঞ্জন ফোঁটা ললাটের মাঝে ॥

সুচারু চিকুরে সম্মুখের ঝুটি সাজে ।

যে বা নিরখে তার জাগয়ে হিয়া মাঝে ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

অভিরাম শিশুর অল্পপম রূপলাবণ্য ও প্রীতি প্রফুল্ল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। প্রণাম একবার নয়, ক্রমশঃ তিনবার, বীরচন্দ্র যোগনিদ্রায় বিভোর ছিলেন, অকস্মাৎ জাগিয়া হাসিতে লাগিলেন। অভিরামের পুনঃ পুনঃ প্রণামেও শিশুর ভাবান্তর হইল না দেখিয়া অভিরাম অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। মনে করিলেন স্বয়ং ভগবানই বীরচন্দ্ররূপে পুনরায় নিত্যানন্দ গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন পরমানন্দে হরি হরি বলিয়া উদ্দগু নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দও পরম প্রীতিলাভ করিলেন। শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত প্রভু এই শুভসংবাদ পাইয়া অবিলম্বে খড়দহে

উপস্থিত হইলেন। তিনি শিশুর দৈব তেজঃ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া
অনুরাগভরে বলিলেন—

“পুনঃ চোরা আসিয়াছে জাতি নাশার ঘরে ।

ক্ষণে অবধূত-ক্ষণে রহেত সংসারে ॥

চোরের ঘরের চোর নিতি চুরী করে ।

এ চোর ধরিব মোরা কিরূপ প্রকারে ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

তঁাহার আনন্দের সীমা নাই, তিনি ভক্তিপ্রভাবে বীরচন্দ্রের স্বরূপ
উপলব্ধি করিলেন এবং শিশুকে প্রদক্ষিণ করিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগমন
করিলেন। ক্রমশঃ উৎসব শেষ হইলে অগ্ন্যাগ্ন ভক্তগণও দৃষ্টচিতে
গৃহে গমন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভুর আর একটি কন্যা জন্মে,
তঁাহার নাম গঙ্গাদেবী। কান্তপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূত
ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধব আচার্য্যের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন।
ভগনী জেলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামিগণ এই গঙ্গাবংশ বলিয়া
বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী স্বাপরে রেবতী ছিলেন।
ইঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।
কথিত আছে একদিন জাহ্নবাদেবী অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় কূপ-জল উত্তোলন
করিয়া দান করিতেছিলেন, এমন সময় বীরচন্দ্র প্রভু তথায় উপস্থিত
হইলেন। দেবীর হস্তদ্বয় জলপাত্রে আবদ্ধ ছিল, অমনি তিনি অপর
দুই হস্ত বাহির করিয়া বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। বীরচন্দ্র
প্রভু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তঁাহার নিকট
মন্ত্র গ্রহণ করেন।



ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

•••••

লীলাবসান ।

“কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে ।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥”

সুখের পর দুঃখ, সংযোগের পর বিয়োগ, মিলনের পর বিচ্ছেদ ইহা ভগবানের রাজ্যের অলঙ্ঘ্য নিয়ম । নিত্যানন্দ খড়দহে আসিয়া প্রেমের বন্যায় ভাসাইলেন, ভক্তির ঢেউ তুলিলেন, খড়দহবাসী ভক্তি ভাগীরথীর পুত-বারিতে অবগাহন করিয়া নির্মল আনন্দ অনুভব করিলেন ; কিন্তু আনন্দ তাহাদের পক্ষে অধিককাল স্থায়ী হইল না । অকস্মাৎ নির্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল, নিদাঘকালের সান্ধ্য গগনের ন্যায় খড়দহের ভাগ্যাকাশ সহসা বিষাদ মেঘে আবৃত হইল । যখন খড়দহে বড় আনন্দ, যখন দয়ালু নিতাই প্রেম-সমুদ্রে আপামর সাধারণ সকলেই ভাসমান, তখন সহসা নিত্যানন্দের ভাবান্তর উপস্থিত হইল ।

গৌর প্রেমের নূতন ভাব-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অত্যাগত ভাব ছিন্ন হইয়া গেল । তিনি সকল ভুলিয়া সর্বদা কৃষ্ণ কথা আলাপ করেন, কখনও অনুরাগ ভরে বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাঁহার নিমিত্ত যে ভক্তগণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, এ কথা তাঁহার বিন্দুমাত্রও মনে নাই ; কখনও বা ভক্তগণকে বলেন, “তোমরা গৌরগুণ গান কর, তাহা হইলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিবে।”

“চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই বিলাপ ।

কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্য আলাপ ॥

কায় মনো বাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায় ।

উচ্চ শব্দ করিয়া সদা গৌরাজ্ঞ গুণ গায় ॥

আপনে গৌরাজ্ঞ গাই গাওয়ায় জগতে ।

গৌরাজ্ঞের গুণ গাও পাবে নন্দ স্নতে ॥”

(নিঃ বংশবিস্তার ।)

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর নিত্যানন্দের ভাব আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিছুতেই তাহার পরিবর্তন ঘটিল না । ক্রমশঃ সেই ভীষণ দুর্দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, অবশেষে যে দিনের কথা লিখিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ে দুর্কিসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, লেখনী আপনা হইতেই নিশ্চল হইয়া পড়ে, ১৪৬৪ শকের সেই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইল ।

সেদিন প্রাতঃকাল হইতে শ্রামসুন্দরের মন্দিরে মধুর কীর্তন আরম্ভ হইল । নিত্যানন্দ, অদ্বৈতপ্রভু ও অত্যাগত অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ লইয়া আনন্দে কীর্তন করিতে লাগিলেন ; ক্রমে ক্রমে তাঁহার

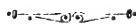
ভাবাবেশ হইল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ নিত্যানন্দের এইরূপ ভাব বিহ্বলতা দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কেহই উপযুক্ত কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে দেখিতে দেখিতে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিত হইল, ভক্তগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, প্রভু অপ্রকট হইলেন। খড়দহ বিষাদ-কালিমায় আবৃত হইল, প্রকৃতি দেবী শোকচ্ছদ পরিধান করিলেন, ভক্তগণের সুখস্বর্ষা চিরতরে অন্তর্মিত হইলেন।

ধর্ম-জগতে ১৪৫৫ শকাব্দায় একটা হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটিয়া ছিল, আর ১৪৬৪ শকে এই একটা বিয়োগান্তক দৃশ্যের অভিনয় হইল।

সমাপ্ত ।



পরিশিষ্ট ।



নিত্যানন্দ-শাখা ।

নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার বংশের তিনটি শাখা বাহির হয়। রামচন্দ্র, গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। ইঁহারা ত্রীপাট খড়দহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। অজ্ঞাপি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ ত্রীপাট খড়দহ, মালদহ, কলিকাতা, ঢাকা, বুতনী, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, নবদ্বীপ ও মেদিনীপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিতেছেন।

শিষ্য-শাখা ।

নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য সম্প্রদায় মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত, কৃষ্ণদাস, কংসারি সেন, গৌরীদাস, জগদীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ, আশ্বরাম দাস, কান্হরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, জ্ঞানদাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, ব্রন্দাবন দাস, মনোহর দাস ও বলরাম দাসই প্রধান ছিলেন।

প্রার্থনা ।

কেমনে পাইব তোমা

তুমি নাথ, প্রেমময়,
নরকের কীট আমি

অপবিত্র এ হৃদয় ।

সতত ডুবিয়া আছি

পাপের পঙ্কিল নীরে ।

তোমাকে পাইতে প্রিয়,

কাম-পাপ টেনে ধরে ।

দাও গো শক্তি নাথ,

ভকতির সূতা দিয়া ।

বাঁধিব শকত ক'রে

আপনার নত হিয়া ।

দেহ-কূপে কাম-কোট

হবে সদা ওতপ্রোত ।

নবীন প্রেমের পথে

বহিবে জীবন স্রোতঃ ।

ফুটিয়া উঠিবে চোখে

তোমার মধুর ভাতি ।

একে একে কু বাসনা

লুকাইবে রাতারাতি ।

প্রতিদিন তব গাথা

গাব আমি স্তমধুর ।

তুমি মোরে দাও ভাষা

তুমি মোরে দাও সুর ।

তুমি মোর চিতে দাও

নূতন বঙ্গার তুলে ।

তড়িৎ-প্রবাহে ডুবি

জগৎ যাই গো ভুলে ।

নয়নের কাছে প্রভু,

সতত বেড়াও অঁচে ।

গড়িব মুরতি তব

ঢেলে এই হৃদি ছাঁচে ।

রাখিয়া চোখের বুকে

নবীন নীরদ রূপ,

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম

বিভূষিত বিশ্বভূপ ।

পূজিব হৃদয় ভ'রে

বাসনার আছে রুচি ।

তুমি যদি দাও মোরে

চিন্তের বিশুদ্ধ শুচি ।

জানি দেব, কাল-চক্র

অচল কখনো নয় ।

তোমার আদেশে সদা

সে গাহে বিশ্বের জয় ।

নির্বাপ মুক্তি পথে

মানব যেতেছে স'রে ।

আমি কিন্তু পড়ে আছি

সে বত্বের বহু দূরে ।

নাহি পূরি অত আশা

হৃদয়ের অন্ত ভাগে ।

জানি তুমি শক্তীশ্বর

সোহহং এর পূর্ণ যাগে ।

আছতি না দিব দেহ

আমি যে শক্তি হীন ।

আমি চাই তব পদে

হে নাথ, হইতে লীন ।

পূর্ণ কর অভিলাষ

শ্রীচরণে নিবেদন ।

হয় যেন শান্তিময়

কর্ম-ক্রিয় এ জীবন ।

